আমরা সেই সে জাতি

আবুল আসাদ

দুই

আমরা সেই সে জাতি

[দ্বিতীয় খণ্ড]

আবুল আসাদ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

প্রকাশক
এ.কে.এম. নাজির আহমদ
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৮৬২৭০৮৬, Fax ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৮৬২৭০৮৭, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-31-0932-5 set

প্রথম প্রকাশ ঃ অকটোবর ১৯৯২
একাদশ প্রকাশ ঃ রমাদান ১৪৩৩
শ্রাবণ ১৪১৯
অগাস্ট ২০১২

মুদ্রণ
আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭।

বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Amra Shei She Jati Vol-II Written by Abul Asad and Published by AKM Nazir Ahmad Director Bangladesh Islamic Centre Kataban Masjid Campus Dhaka-1000 First Edition October 1992 11th Edition August 2012 Price Taka 50.00 only.

সূচীপত্র

পন্ডিত ওয়ারাকার আক্ষেপ

বিশ্ব জগতের রহমত নবুওয়াতের আলোক ধারায় স্নাত হলো হেরা গিরিগুহা। —নবুওয়াত লাভ করলেন মহানবী। অভূতপূর্ব আবেগ-উত্তেজনায় অভিভূত হযরত ফিরে এলেন হেরা গিরিগুহা থেকে খাদীজার কুটিরে। সহধর্মিনী খাদীজাও উদ্বেগাকুল। শুনলেন তিনি মহানবীর কাছ থেকে হেরা গিরিগুহার সব কথা। তারপর সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আপনি নিশ্চিত হোন, আনন্দিত হোন, আল্লাহ আপনাকে কখনই বিপর্যস্ত করবেন না। স্বজনদের চির শুভাকাংখী বন্ধু আপনি, পর দুঃখভার বহনকারী মহাজন আপনি, দরিদ্রের সেবক আপনি, যার কেউ নেই তার আপনজন আপনি- আল্লাহ আপনাকে কখনও বিপর্যস্ত করবেন না।"

কিন্তু সান্ত্বনা দেয়ার পর খাদীজাও যেন সান্ত্বনা পেতে চাইলেন। তাই মহানবীকে সাথে নিয়ে খাদীজা (রা) এলেন চাচাত ভাই খৃষ্টান শাস্ত্র বিশেষজ্ঞ ওয়ারাকা ইবন নওফেলের কাছে। এসে বললেন, "ভাই, তোমার ভ্রাতুস্পুত্র কি বলছেন, শুন।" ওয়ারাকা সব কথা শুনলেন নবীর কাছ থেকে। শুনে তিনি উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, "কুদ্দুসুন কুদ্দুসুন, মূসার কাছে আল্লাহ যে 'নামুস" পাঠিয়েছিলেন, এ সেই নামুস।" বৃদ্ধ ওয়ারাকা একটু দম নিলেন। বোধ হয় ভাবনার গহীনে একটু ডুব দিলেন। তারপর বলে উঠলেন, "হায় হায়, আজ যদি আমি যুবাবস্থায় থাকতাম! যখন তোমার স্বজাতীয়রা তোমাকে দেশান্তরিত করবে, তখন যদি আমি বেঁচে থাকতাম!"

ওয়ারাকার কথা শুনে বিস্মিত মুহাম্মাদ বললেন, "আমাকে কি তারা দেশ থেকে বের করে দেবে?" ওয়ারাকা জবাব দিলেন। বললেন, "নিশ্চয়ই, আর এটা শুধু তোমার ব্যাপার নয়। তুমি যে সত্য পেয়েছ, তা যারাই পেয়েছে তারা দেশবাসীর কোপানলে পড়েছে। হায়, আমি যদি ততদিন বেঁচে থাকি, তাহলে আমি নিজের সমস্ত শক্তি নিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াব।"

মক্কায় রেওয়াজ ছিল কোন ভয়ংকর বিপদের আশংকা করলে অথবা কোন গুরুতর বিষয়ে বিচারপ্রার্থী হলে কোন পর্বতের উপর উঠে বিশেষ কতকগুলো শব্দ উচ্চারণ করা। মহানবী মক্কাবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এই পথই অনুসরণকরলেন।

আল্লাহর ঘর কা'বার অতি নিকটের সাফা পর্বতে মহানবী উঠলেন একদিন অতি প্রত্যুষে। গম্ভীরে–করুণে সেই বিশেষ আহবান ধ্বনিত হলো মহানবীর কণ্ঠে। ভোরের নীরবতা ভেঙ্গে সে আহবান ছড়িয়ে পড়ল মক্কার ঘরে ঘরে। মানুষ এসে সমবেত হলো সাফা পাহাড়ে। মক্কার সব গোত্র, সব মানুষ এসে হাজির হলে মহানবী প্রত্যেক গোত্রের নাম ধরে ধরে বলতে লাগলেন ঃ "হে কোরেশ বংশীয়গণ, আজ আমি যদি তোমাদের বলি, পর্বতের অপর পাশে প্রবল এক শত্রু বাহিনী তোমাদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করার জন্য অপেক্ষা করছে, তাহলে কি তোমরা আমার একথা বিশ্বাস করবে?"

মক্কার কে না তাদের আল–আমিনকে চিনে? আজন্ম সত্যবাদী তাদের প্রিয় আল–আমিন কোন মিথ্যা বলতেই পারেন না। মক্কাবাসীরা সমস্বরে বলে উঠল, "নিশ্চয়ই বিশ্বাস না করার কোনও কারণ নেই।"

আল্লাহর নবী তখন গুরুগম্ভীর স্বরে বললেন, "তবে শোন, আমি তোমাদেরকে (পাপ ও খোদাদ্রোহিতার) অবশ্যম্ভাবী কঠোর দন্ডের কথা স্বরণ করিয়ে দিচ্ছি। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরগণ, হে আব্দ মনাফের বংশধরগণ, হে জোহরার বংশধরগণ ··· আমার আত্মীয়স্বজনকে উপদেশ দেয়ার জন্য আমার প্রতি আল্লাহর আদেশ এসেছে। তোমাদের ইহকালের মঙ্গল ও পরকালের কল্যাণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু' না বল।"মহানবীথামলেন।

দ্বীনে হকের বুলন্দ আওয়াজ যুগযুগান্তের নীরবতা ভেঙ্গে ইথারের কণায় কণায় কাঁপন জাগিয়ে ছড়িয়ে পড়ল চারদিকে। কিছু দূরে দাঁড়ানো জাহেলিয়াতের অষ্টোপাশে বন্দী আল্লাহর ঘর কা'বায় তা প্রতিধ্বনিত হল। প্রতিধ্বনিত হলো পাহাড় থেকে পাহাড়ে। বহুশত বর্ষ পরে দ্বীনে হকের দাওয়াত তার নতুন এবং চূড়ান্ত যাত্রা শুরু করল। পৃথিবীব্যাপী জাহেলিয়াতের জমাট অন্ধকারে এ আলোর বিস্ফোরণ সাফা পর্বতের সানুদেশে দাঁড়িয়ে

দুনিয়াবাসীর পক্ষে মক্কাবাসী যারা এ দাওয়াত শুনছিল তারা নীরব নিস্পন্দ।

নীরবতা ভেঙ্গে প্রতিক্রিয়ার কন্ঠ জাগ্রত হলো। আবু লাহাব বলল, "তোর সর্বনাশ হোক, এ জন্যই কি আমাদের ডেকেছিলি!" প্রতিক্রিয়ার এ কণ্ঠে যেন হিংস্রতা ঝরে পড়ল।

প্রথম বিজয় নিশান উড়লো

নবুওয়াতের গুরু দায়িত্ব নিয়ে ধীর যাত্রা শুরু হয়েছে মহানবীর(সা)। গোটা ধরণীটাই অন্ধকারে নিমজ্জিত, তিনিই মাত্র আলোর এক শিখা। সমূলে জেঁকে বসা ঐ অন্ধকার তার আপ্রাণ হিংস্রতা নিয়ে আলোর অস্তিত্ব বিনাশে উদ্যত। এরই মধ্যে শুরু হলো আলোর সন্তর্পণ যাত্রা। তিন বছর ধরে প্রচার চললো সংগোপনে। আলোর কাফিলায় এসে শামিল হলো খাদীজা, আলী, যায়েদ, উম্মে আয়মান, আবুবকর সিদ্দিক, উসমান, জোবায়ের, তাল্হা, আবু ওবাইদা, আব্দুল্লাহ ইবনে মসউদ (রা) প্রমুখ। কিন্তু প্রকাশের জন্যই যে আলোর আগমন তার আত্মগোপন আর কত? প্রতিক্রিয়ার মুকাবিলা এবং বাধার পাহাড় ডিঙানোই যে পথের স্বভাবধর্ম তা কি আত্মপ্রকাশ না করে পারে? পারে কি আপোষ করে চলতে? এল অবশেষে সে প্রকাশের দিন। নাযিল হলো আল্লাহ তায়ালার নির্দেশ ‥ "তোমার প্রতি যে আদেশ তা তুমি স্পষ্ট করে শুনিয়ে দাও এবং মুশরিকদের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করো না।"

প্রকাশ্য দাওয়াতের প্রথম সম্মেলন মহানবী (সা) ডাকলেন তাঁর বাড়ীতেই। মহানবীর দাওয়াতে বনু হাশিম বংশের প্রায় ৪০ জন প্রধান ব্যক্তি হাজির হলেন তাঁর গৃহে। গোপন প্রচারের খবর কেউ কেউ জানতেন, জানতো আবু লাহাবও। সে আঁচ করতে পেরেছিলো নবী কি বলতে চান এ সম্মেলনে। তাই খাওয়া-দাওয়া শেষে মহানবী যেই বলতে শুরু করলেন, হট্টগোল বাধালো আবু লাহাব। বললো সে, "দেখ মুহাম্মাদ, তোমার চাচা, চাচাতভাই সকলেই এখানে উপস্থিত, চপলতা ত্যাগ কর। তোমার জানা উচিত, তোমার জন্য সমস্ত আরব দেশের সাথে শত্রুতা করার শক্তি আমাদের নেই। তোমার আত্মীয়-স্বজনের পক্ষে তোমাকে ধরে কারারুদ্ধ করে রাখা উচিত। তোমার ন্যায় স্ববংশের এমন সর্বনাশ কেউ করেনি।"

সেদিন সম্মেলন ভেংগে গেল। মহানবী (সা) তাঁর বাড়ীতে ইসলামের বাণী প্রচারের জন্যে আবার সম্মেলন ডাকলেন– দাওয়াতের দ্বিতীয় সম্মেলন। বনু হাশিমের প্রধানবর্গ আবার হাজির হলেন। হাজির হলেন আবু লাহাবও। এবার মহানবী (সা) আবু লাহাবকে কোন কূটনীতির সুযোগ দিলেন না। খানা–পিনার পরই উঠে দাঁড়িয়ে মহানবী তাঁর দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি বলেন, "সমবেত ব্যক্তিগণ, আমি আপনাদের জন্য ইহকাল–পরকালের এমন কল্যাণ এনেছি যা আরবের কোন ব্যক্তি তার স্বজাতির জন্য আনেনি। আমি আল্লাহর আদেশে সেই কল্যাণের দিকে আপনাদের আহবান করছি। সত্যের এ মহা সাধনায়, কর্তব্যের কঠোর পরীক্ষায় আপনাদের মধ্য থেকে কে আমার সহায় হবেন, কে আমার সাথী হবেন?"

মজলিসে কারো মুখে কোন কথা নেই। একক এক ব্যক্তির কণ্ঠ থেকে আসা সত্যের বজ্র নির্ঘোষ বনুহাশিমের শক্তিমান প্রবীণদের যেন হতবাক করে দিয়েছে। বাচাল আবু লাহাবও সে মৌনতা ভাঙতে পারলো না, পারলো না সশব্দে সে দাওয়াত প্রত্যাখ্যাত করতে। হকের এ কণ্ঠের দাওয়াত যেন শত কণ্ঠের শক্তি নিয়ে ছড়িয়ে পড়ল।

অবশেষে মৌনতা ভাঙল। ভাঙলেন আবু তালিব পুত্র মহানবীর চাচাতো ভাই বালক আলী। সবাইকে শুনিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বললেন, "এই মহাব্রত গ্রহণের জন্য আমি প্রস্তুত আছি।"

বনু হাশিমের কোনও প্রধানের মুখে কোন কথাই আর জোগাল না। শুধু আবু লাহাবই প্রকাশ্য দাওয়াতের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়ার প্রথম প্রকাশ ঘটিয়ে, রাসূলকে নয়, আবু তালিবকে বললেন, "দেখছেন আপনার ভ্রাতুষ্পুত্রের কল্যাণে এখন আপনাকে স্বীয় বালকপুত্রের অনুগত হয়ে চলতে হবে।" কিন্তু আবু লাহাবের এ প্রতিক্রিয়া বিজয়ীর নয়, বিজিতের। দাওয়াতে হকের প্রথম বিজয় নিশান উড়ল এইভাবেই।

সব বাধা ডিঙিয়ে মহানবীর (সা) ইসলাম প্রচার চলছেই অবিরাম। সব দেখে কুরাইশ প্রধানরা অধৈর্য হয়ে উঠলো। অনেক সলাপরামর্শের পর তারা একযোগে এসে আবু তালিবকে বললো, "দেখুন, আপনার বয়স, আপনার বংশ গৌরব এবং আপনার সম্ভ্রমের প্রতি আমরা সকলেই সম্মান প্রদর্শন করি। এ জন্যই আপনার ভাতিজা সম্পর্কে আপনাকে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলাম। আপনি নিশ্চিত থাকুন আপনার ভাতিজার অত্যাচার আর আমরা কিছুতেই নীরবে সহ্য করব না। আপনি তাকে নিবৃত্ত করুন নতুবা তার সাথে আপনাকেও আমরা একদল হিসেবে দেখব– দু'দলের মধ্যে একদল ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত আমরা ক্ষান্ত হবো না।"

বৃদ্ধ আবু তালিব কুরাইশ প্রধানদের এই চরমপত্র নীরবে গ্রহণ করলেন। এই কুরাইশদের একজন হিসেবে তিনি সবাইকে ভালভাবেই চিনেন। জানেন তিনি তাদের হিংসার আগুন কতদূর পোড়াতে পারে। আরও তিনি বুঝলেন, তারা এবার আট-ঘাট বেঁধেই এসেছে। সান্ত্বনা দিয়ে আর তাদের ফেরানো যাবেনা। এই প্রথমবারের মত আবু তালিব সত্যই নিজেকে বিচলিত বোধ করলেন। ভাবলেন। ভেবে নিয়ে তিনি ভাতিজাকে ডেকে পাঠালেন তাঁর কাছে এই দরবারে।

দরবার নীরব নিস্তব্ধ। আবু তালিবের বিষণ্ন মুখে চিন্তার কালো রেখা। বোধহয় কুরাইশ প্রধানদের মনের কোণায় আত্মতৃপ্তির হাসি ঃ এবার আবু তালিবকে ওষুধে ধরেছে। সবার আক্রোশকে চ্যালেঞ্জ করার সাধ্য বুড়ো আবু তালিবের নেই। দরবারের এমন পরিবেশেই মহানবী এসে হাজির হলেন।

কুরাইশ প্রধানরা এখন উদগ্রীব আবু তালিব তার ভাতিজাকে কি বলেন তা শোনার জন্য। বৃদ্ধ আবু তালিব মহানবীকে কুরাইশদের কঠোর সংকল্প এবং ভয়াবহ পরিণতির কথা বুঝিয়ে বলার পর সস্নেহে বললেন, "বাবা একটু বিবেচনা করে কাজ কর, যে ভার বইবার শক্তি আমার নেই আমার উপর তা চাপিয়ে দিও না।"

চাচা আবু তালিব কি বলতে চান, মহানবী তা বুঝলেন। তিনি আরও বুঝলেন, জাগতিক যে আশ্রয়টুকু তাঁর ছিল তার ভিতও আজ নড়ে উঠেছে।

কিন্তু তিনি বিচলিত হলেন না একটুকুও। তিনি বললেন, "চাচা, আমার প্রতি এমন কঠোর না হয়ে এরা আমার কথা মেনে নিক তাহলে সমস্ত আরব বেহেস্তি ধর্ম বন্ধনে আবদ্ধ হবে, সমস্ত আজম আরবের পদতলে লুটিয়ে পড়বে।"

আধিপত্যের গন্ধ পেয়ে আবু লাহাব ও অন্যান্যরা একবাক্যে বলল, 'কি, কি সে কথা, খুলে বল। একটা কেন, তোমার দশটা কথা আমরা শুনতে প্রস্তুত আছি।' মহানবী গম্ভীর কন্ঠে বললেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, এতে বিশ্বাস স্থাপন করুন।"

মহানবীর একথায় বারুদের মত জ্বলে উঠল কুরাইশ প্রধানরা। যে মুখ, যে কথা তারা বন্ধ করতে এসেছে, একেবারে তাদের মুখের উপরেই সেই কথা।

অবস্থা দৃষ্টে আবু তালিবও নবীকে (সা) কয়েকটি ভীতি ও বিষাদপূর্ণ উপদেশদিলেন।

ভীষণ এক পরিস্থিতি তাঁর সামনে। মারমুখো কুরাইশরা একদিকে, অন্যদিকে পিতৃব্য আবু তালিবেরও আজ অসহায় সুর। জাগতিক কোন অবলম্বনই তাঁর সামনে আর থাকলো না। কিন্তু তিনি কোন দিকেই ভ্রূক্ষেপ করলেন না। পিতৃব্যের দিকে তাকিয়ে তেজোদীপ্ত কন্ঠে তিনি বললেন, "চাচা, এরা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চাঁদ এনে দেয়, তাহলেও আমি এ মহাসত্য ও নিজের কর্তব্য থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে দাঁড়াব না। হয় আল্লাহ একে জয়যুক্ত করবেন, না হয় আমি ধ্বংস হয়ে যাব। কিন্তু আপনি নিশ্চিত জানুন, মুহাম্মাদ কখনই নিজের কর্তব্য পরিত্যাগ করবে না।" মহানবী থামলেন। এক পবিত্র ভাব ও আবেগে তার চোখ দু'টি অশ্রু সজল হয়ে উঠল।

কুরাইশ প্রধানদের মিশন ব্যর্থ হলো। নানা প্রকার হুমকি ধমকি দিতে দিতে তারা সদল বলে আবু তালিবের বাড়ী থেকে চলে গেল।

আবু তালিব নীরব ছিলেন। ভাতিজার তেজোদীপ্ত কথায় চোখ দু'টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগের সেই বিষণ্নতা, দুর্বলতা তাঁর কেটে গেছে। তিনি ভাতিজাকে বললেন, "প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র, নিজের কর্তব্য পালন করে যাও, আল্লাহর শপথ আমি কোন অবস্থাতেই তোমাকে পরিত্যাগ করবো না।"

মক্কার ঘরে ঘরে এখন তাওহীদের দাওয়াত মুখ্য আলোচনার বিষয়। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে ইসলামের দাওয়াত মক্কার সমাজ-জীবনের গভীর থেকে গভীরে প্রবেশ করতে লাগল। সেই সাথে বিস্তার ঘটতে লাগল প্রতিক্রিয়ারও। ইসলামের ধীরগতি বিস্তার আবু লাহাবদের দৃষ্টি এড়ালো না। শক্তির জোরে বাধা দেয়ার একটা মানসিকতা তাদের মধ্যে দানা বেঁধে উঠল। কিন্তু আল্লাহর নবী এই ইবলিসী প্রতিক্রিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করবেন কেন? হকের দাওয়াত অবিরাম পৌঁছিয়েই চলতে হবে- মানুষের ঘরে ঘরে প্রতিটি কানে কানে।

মহানবী সাফা পর্বতে দাঁড়িয়ে দাওয়াত দিয়েছেন। কিন্তু সমাজের মিলন কেন্দ্র আল্লাহর ঘর কা'বায় গিয়ে মানুষের কাছে তাঁর দাওয়াত পৌঁছানো হয়নি এখনও।

একদিন কতিপয় মুসলিম সাথী নিয়ে তিনি কা'বায় এলেন। সেখানে অনেক মানুষ- কা'বার চারদিকের রাসিন্দা। সবাই নবীর (সা) স্বজন-স্বগোত্র। মহানবী (সা) সেখানে হাজির হয়ে ইসলামের কথা, তাওহীদের দাওয়াত উচ্চারণ করছিলেন। প্রতিক্রিয়ার আগুন জ্বলে উঠল সংগে সংগেই।

প্রথমে কানা-কানি, তারপর শোরগোল। প্রতিক্রিয়ার শক্তি এই প্রথমবারের মত সংঘবদ্ধভাবে নবীর (সা) উপর দৈহিক আক্রমণের ঔদ্ধত্য নিয়ে ছুটে এল। খাদীজার সন্তান (পূর্বস্বামীর) তরুণ মুসলিম হারিস ইবনে আবিহালাহ তাদের সামনে দাঁড়ালেন। প্রতিবাদ করলেন। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির সমস্ত ক্রোধ গিয়ে তাঁর উপর পড়ল। আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হলেন হারিস। তাঁর দেহের লাল রক্তের স্রোত রঞ্জিত করলো কাবার চত্বরকে। হারিস শহীদ হলেন- ইসলামের প্রথম শহীদ।

আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার ছোট্ট কাফিলা এই প্রথম এক জীবনের কুরবানী দিল। শুরু হলো প্রতিক্রিয়ার সাথে সেই চিরন্তনী সংঘাত আর রক্তরঞ্জিত পথযাত্রার।

একদিন মহানবী কা'বার চত্বরে একাকী বসে আছেন। তিনি আপন ভাবে বিভোর।

আবু জাহল গিয়ে সেখানে উপস্থিত হলো। নানা প্রকার ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করে মহানবীর (সা) ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতে চেষ্টা করল। কিন্তু অনেক চেষ্টাতেও তাঁর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারলোনা। অবশেষে নবীকে (সা) লক্ষ্য করে সে অনেক গালমন্দ করে। আবু জাহলের এই মূঢ়তায় মহানবী ব্যথিত হলেন। ফিরে এলেন তিনি বাড়ীতে।

মক্কার একজন ক্রীতদাসী সব ঘটনা দেখল। সব কথা সে এসে মহানবীর পিতৃব্য হামজাকে বলে দিল। হামজা সবে শিকার থেকে ফিরেছেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি আবু জাহলের আচরণের কথা শুনে ক্রোধে জ্বলে উঠলেন। প্রশ্ন তার মনে তার সৎ ও সাধু সজ্জন ভাতিজা কি দোষ করেছে যে সবাই তার উপর অত্যাচার করবে? সে কোন্ কথাটি খারাপ বলে?

হামজা শিকারের ধনুক কাঁধে নিয়ে আবু জাহলের সন্ধানে বের হলেন। কাবা ঘরে তাকে পেয়ে সক্রোধে ধনুক দিয়ে তার মাথায় আঘাত করতে লাগলেন এবং হুঙ্কার দিয়ে বলে উঠলেন, "পাষন্ড! আর তুই মুহাম্মাদের উপর অত্যাচার করবি? আচ্ছা, আমিও মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণ করেছি, কি করবি কর!"

অতপর হামজা চলে এলেন মহানবীর কাছে। মহানবীকে বললেন, 'আনন্দিত হও ভাতিজা, আবু জাহলকে শায়েস্তা করেছি।'

মহানবী সব বুঝলেন। কিন্তু আনন্দ কিংবা কৃতজ্ঞতার কোন ভাবই তাঁর মুখে প্রকাশ পেলনা। তিনি বললেন, "চাচা, এতে আনন্দের কিছুই নেই। যদি শুনতাম যে আপনি সত্যকে গ্রহণ করেছেন, তাহলে তা আমার জন্য আনন্দের ব্যাপারহতো।"

হামজার হৃদয় দুলে উঠল। আরো মনে পড়ল, মুহাম্মাদের ধর্ম গ্রহণের কথা তিনি আবু জাহলকে বলেই এসেছেন। এবার অন্তর থেকে তার সাক্ষ্য বেরিয়ে এল লা ইলাহা ইলাল্লাহু।

এইভাবে কুরাইশদের প্রতিদিনের অত্যাচার ইসলামের নতুন নতুন সাফল্যই এনে দিতে লাগল।

কুরাইশ প্রধানরা শলাপরামর্শ করে ঠিক করল মুহাম্মাদকে তার বাঞ্ছিত কিছু দিয়ে নিরস্ত্র করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সকলে মিলে মক্কার বিখ্যাত ধনী ও সর্দার উৎবাকে দূত হিসাবে ঠিক করল।

সে সময় মহানবী (সা) কাবা গৃহে একাকী বসেছিলেন। এই সুযোগে কুরাইশ প্রধানদের দূত হিসেবে উৎবা এসে তাঁর কাছে উপবেশন করলেন। তারপর রাসূলুল্লাহকে (সা) লক্ষ্য করে নরম সুরে বলতে লাগলেন, 'দেখ বাছা, তুমি আমাদের পর নও, কিন্তু যে বিপ্লব নিয়ে আসছ তা কি, তুমি জান। পূর্ব-পুরুষের ধর্ম থেকে আমাদের বিচ্ছিন্ন করে নতুন এক অভিনব ধর্ম সৃষ্টি করছ ····। এরূপ করার উদ্দেশ্য কি আজ তুমি আমাকে খুলে বল। ধন যদি চাও তাহলে আমরা তোমার পদপ্রান্তে স্বর্ণ ও রৌপ্যের স্তূপ এনে দেব। সম্মান যদি চাও তাহলে আমরা সকলে এক বাক্যে তোমাকে প্রধান হিসাবে মেনে নেব। রাজত্ব করার আকাংখা যদি থাকে তাহলে আমাদের বল, তোমাকে গোটা আরবের অধিপতি পদে অভিষিক্ত করব····। সব কিছুর বিনিময়ে তোমার কাছে আমাদের শুধু প্রার্থনা তোমার ঐ অভিনব ধর্মের কথা তুমি একেবারে ভুলে যাও।"

উৎবার দীর্ঘ বক্তব্য শেষ হলে মহানবী (সা) হা-মীম আস্ সাজদাহ সূরা থেকে পাঠ করতে শুরু করলেন ঃ "হা-মীম, দয়ালু করুণাময়ের পক্ষ থেকে এই গ্রন্থ, যার বাণীগুলি বিজ্ঞ লোকদের জন্য স্পষ্ট আরবী ভাষায় বিশদরূপে বিবৃত হয়েছে এবং যা (পুণ্যের পুরস্কারের) সুসংবাদ দান করে ও পাপের (দন্ড সম্বন্ধে) সতর্ক করে থাকে। অনন্তর তাদের অধিকাংশই মুখ ফিরিয়ে নিল, তারা (উপদেশ) শ্রবণ (গ্রহণ) করে না। তারা বলে, যে (তাওহীদের) দিকে আমাদেরকে আহবান করছে, আমরা তার ধারণা করতে পারিনা, তোমার কথা আমাদের কর্ণে প্রবেশও করে না। আর আমাদের ও তোমার মধ্যে একটা যবনিকা পড়ে আছে। অতএব তুমি চেষ্টা করতে থাক, আমরা চেষ্টায় রইলাম····।"

এইভাবে মহানবী (সা) সূরার পাঁচটি রুকূ তেলাওয়াত করলেন। অবশেষে সিজদার আয়াতে এসে সিজদা করে তেলাওয়াত শেষ করলেন।

উৎবা মন্ত্রমুগ্ধের মত সবকিছু শুনলেন। কুরআনের সুললিত ছন্দ ও কথা তাঁকে একেবারে অভিভূত করল। এত সম্পদ, এত সম্মান, এত বড় রাজ সিংহাসনের লোভ এমন অবলিলাক্রমে প্রত্যাখ্যান করতে দেখে উৎবা স্তম্ভিত হলেন। তিনি আনন্দ ও বিষাদে পূর্ণ এক মানসিক অবস্থা নিয়ে কুরাইশ সর্দারদের মজলিসে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সকলের সাগ্রহ প্রশ্নের জবাবে তিনি বললেন, "সেখানে যা' শুনলাম আল্লাহর শপথ তেমন আর কখনও শুনিনি, আল্লাহর শপথ, ভাষার দিক দিয়ে তা' কখনই কবির রচনা নয় এবং ভাবের দিক দিয়ে কখনই তা' যাদুমন্ত্র নয়। হে কুরাইশ সমাজ, আমার উপদেশ, এই ব্যক্তি যা' করে করুক তা' নিয়ে তোমরা আর গন্ডগোল করো না।"

উৎবার কথা কুরাইশ প্রধানদের চমকে দিল। তারা বলে উঠল, 'তাহলে মুহাম্মাদের যাদু তোমার উপরও কাজ করতে শুরু করেছে!'

কুরাইশ প্রধানরা ঠিক করল, মুহাম্মাদকে (সা) সমাবেশে হাজির করে সকলে মিলে তাকে বুঝাতে হবে, বুঝাপড়া তার সাথে একটা করে ফেলতে হবে। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মহানবীর কাছে একজন দূত পাঠানো হলো।

দূত গিয়ে মহানবীকে কুরাইশ দরবারে হাজির হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল, 'আপনার স্বজাতীয় ভদ্রজনরা আপনার সাথে দু' একটা কথা বলতে চান'।

মহানবী এ খবর পাওয়ার পর বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। উপস্থিত হলেন গিয়ে কুরাইশ দরবারে। শত্রু সমাবেশে তিনি হাজির হয়েছেন,এনিয়ে চিন্তার সামান্য লেশও তাঁর মধ্যে ছিল না। আরও অনেকের কাছে তিনি আল্লাহর দাওয়াত পৌঁছাতে পারবেন, এই মুহূর্তে এই আনন্দই তাঁর কাছে বড়।

কুরাইশ প্রধানরা উৎবার মত তাঁকে লক্ষ্য করে বলতে লাগল, "সম্মান, সম্পদ, সিংহাসন যা চাও দিতে প্রস্তুত আছি। তুমি আমাদের উপদেশ গ্রহণ কর," · · · ইত্যাদি।

তাদের সব কথা শুনে মহানবী বললেন, "আমি আপনাদের কাছে সম্পদের ভিখারী নই, রাজা হবার আকাঙ্খা আমার নেই।· · · প্রকৃত কথা এই যে, আল্লাহ সত্য ও জ্ঞানের আলোক দিয়ে ইহ-পরকালের মুক্তির পথ দেখানোর জন্য আমাকে আপনাদের কাছে পাঠিয়েছেন। · · · · এই বাণী গ্রহণ করলে এর দ্বারা আপনারাই ইহ-পরকালে সুফল পাবেন। আর যদি একে অস্বীকার করেন আমি ধৈর্য ধারণ করে থাকব- আল্লাহর যা ইচ্ছা তাই হবে।"

অনুরোধে-প্রলোভনে কোন ফল হলো না দেখে কুরাইশ প্রধানরা মহানবীকে ভীষণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করতে লাগল। কই, তোমার আল্লাহকে বলে আমাদের মরুভূমিতে ইরাকের ন্যায় নদ-নদী করে দাও দেখি, সুজলা-সুফলা করে দাও দেখি,· · ·। অন্ততঃ তোমার জন্য কিছু কর। তোমার আল্লাহ দেবাত্মাকে তোমার সহচর করে দিক, বৃহৎ প্রাসাদ, স্বর্ণ-রৌপ্যের ভান্ডার তোমার জন্য এনে দিক,· · · · ইত্যাদি।

তাদের সব কথার উত্তরে মহানবী ধীর স্বরে বললেন, "এই পার্থিব ধন-সম্পদের জন্য আমি প্রার্থনা করতে পারি না, তা আমার কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত নয়।

আমি বিশ্ববাসীর কাছে এক মহাসত্যের প্রচারক রূপে প্রেরিত হয়েছি···।"

পর পর ব্যর্থতায় এবং মহানবীর অচল–অটল দৃঢ়তায় কুরাইশ প্রধানরা ভীষণভাবে ক্ষেপে গেল। তারা কঠোর ভাষায় বলল, "মুহাম্মাদ, আমাদের সব কথা তোমাকে বলে দিয়েছি। অতঃপর সাবধান, নিশ্চিতরূপে স্মরণ রেখো আমরা আর তোমাকে অধর্মের কথাগুলো প্রচার করতে দেব না– দেহে প্রাণ থাকতে না। এতে হয় আমরা ধ্বংস হব, না হয় তুমি।" এই কথার পর সভাক্ষেত্রে হট্টগোল শুরু হয়ে গেল। নানা দিক থেকে অসহ্য বিদ্রূপ বাণ বর্ষিত হতে লাগল। কিন্তু কোন কিছুই মহানবীর মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারলো না। 'আপন কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে'– এমন প্রসন্নতা নিয়ে মহানবী ধীর পদক্ষেপে অটল পাহাড়ের ন্যায় সভা ক্ষেত্র থেকে চলে এলেন।

আদ দাউস গোত্রের সরদার তুফাইল ইবন আমর মক্কায় এলেন। তিনি ছিলেন কবি। বিজ্ঞতার জন্যেও বিখ্যাত। মক্কাবাসীরা নগরীর গেটে তাঁকে স্বাগত জানাল।

মক্কার সরদাররা তুফাইল ইবন আমরকে মুহাম্মাদ (সা)-এর সাথে দেখা না করার জন্যে সাবধান করে দিল। তারা জানাল, মুহাম্মাদ (সা)-এর কথা মক্কায় ভীষণ বিশৃংখলার সৃষ্টি করছে। সর্বত্র সে একটা খারাপ আবহাওয়া সৃষ্টি করছে।

তদনুসারে তুফাইল ইবন আমর মহানবী (সা)-এর সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে লাগলেন। কখনও তিনি মহানবীর (সা) মুখোমুখি হলে চোখ বুঁজতেন এবং কান বন্ধ করতেন।

ঘটনাক্রমে একদিন যখন মহানবী (সা) কাবায় নামায পড়ছিলেন, তখন তাঁর কণ্ঠ নিঃসৃত কুরআন শরীফের কতগুলো আয়াত তুফাইলের কানে প্রবেশ করল। আয়াতগুলো তাঁর হৃদয়ে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করল। কবি তুফাইল মহানবীর (সা) পিছু পিছু তাঁর বাড়ী গেলেন এবং তাঁকে ঐ আয়াতগুলো পুনরায় পাঠ করতে বলেন। মহানবী (সা) ঐ আয়াতগুলো পাঠ করলেন।

অভিভূত তুফাইল ইবন আমর সংগে সংগে ইসলাম গ্রহণ করেন।

জামাদ নামে ইয়ামেনের একজন কুখ্যাত যাদুকর মক্কায় এলো। সে কুরাইশদের আশ্বাস দিল মুহাম্মাদ (সা)-এর উপর দুষ্ট দেবতার যে আছর তা সে ছাড়িয়ে দেবে। কুরাইশরা খুব খুশী হলো।

জামাদ মহানবী (সা)-এর কাছে গিয়ে হাযির হলো এবং বলল যে, সে তাকে ভালো করে দেবে। মহানবী (সা) তাকে বললেন, তাহলে আগে আমার কিছু কথা শুনুন। তারপর মহানবী (সা) কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত পাঠ করলেন। জামাদ আয়াতগুলো শুনে চমৎকৃত হলো এবং আয়াতগুলো পুনরায় পাঠ করার জন্যে অনুরোধ করল।

মহানবী (সা) আয়াতগুলো দ্বিতীয়বার যখন পাঠ সমাপ্ত করলেন, তখন জামাদ চিৎকার করে বলে উঠল, "আমি বহু ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর ও কবির কথা শুনেছি, কিন্তু আল্লাহ সাক্ষী, এই কথাগুলোর কোন তুলনা নেই। অতলগভীর এই কথাগুলো।"

তারপর সে বলল, "হে মুহাম্মাদ, আপনার হাত এগিয়ে দিন। আমি আপনার আনুগত্যের শপথ করছি।"

নববী ষষ্ঠ সনে কুরাইশরা মহানবী ও তাঁর গোত্রকে বয়কট করে সকলকে এক সাথে ধ্বংস করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। এজন্য মক্কার সকল গোত্র একত্রিত হয়ে একটি দলিল সম্পাদন করল। দলিলে বলা হল ঃ "মক্কার কোন ব্যক্তি বনু হাশিম গোত্রের সাথে আত্মীয়তা করবে না, তাদের কাছে কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করবে না, তাদের কাছে খাদ্য প্রেরণ করবে না। যতদিন পর্যন্ত তারা অর্থাৎ বনু হাশিম রাসূলকে (সা) হত্যার জন্য কুরাইশদের হাতে সমর্পণ না করবে ততদিন পর্যন্ত এই চুক্তি বলবৎ থাকবে।"

মহানবী বনু হাশিমের সমস্ত লোকজনসহ শি'আবে আবুতালিব গিরি-উপত্যকায় আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সুদীর্ঘ তিন বছর তাঁরা অবরুদ্ধ অবস্থায় এই উপত্যকায় অবস্থান করলেন। এই বন্দী জীবন এত কঠোর ছিল যে, জঠরজ্বালা নিবারণের জন্য তাদেরকে গাছের পাতা খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করতে হয়েছে। সা'দ ইবনে আবি ওয়াক্কাস এক দিনের ঘটনা বলেছেন ঃ সেদিন রাত্রিতে তিনি একটি শুকনা চামড়া আগুনে ঝলসিয়ে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করেছিলেন।

ছোট ছোট শিশুরা যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়ে চীৎকার করত, তখন বাহির থেকে কুরাইশরা তা শুনে আনন্দে নৃত্য করত। আবার কোন কোন সহৃদয় ব্যক্তি এতে দুঃখিত হত।

একদিন হযরত খাদীজার (রা) ভ্রাতুষ্পুত্র হাকিম ইবনে হিযাম স্বীয় দানের মাধ্যমে হযরত খাদীজার (রা) নিকট সামান্য পরিমাণ গম পাঠাচ্ছিল। কিন্তু পথের মধ্যে আবু জাহল তা দেখতে পেয়ে ছিনিয়ে নেবার উপক্রম করলে ঘটনাক্রমে আবুল বুখতারি সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যদিও কাফির ছিলেন, তবু অন্তরে তাঁর দয়ামায়া ছিল। তিনি বললেন, ফুফুর কাছে সামান্য খাবার পাঠাচ্ছে তাতে তুমি বাধা দিচ্ছ কেন?

ধীরে ধীরে খোদ কুরাইশদের মধ্যেই চুক্তিভঙ্গের জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেল। হিশাম ইবনে আমর নামক জনৈক ব্যক্তি বনু হাশিমের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছিলেন এবং স্বীয় গোত্রের মধ্যেও অত্যন্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত ছিলেন। তিনি গোপনে গোপনে তাদের কাছে খাদ্য পাঠাতেন। তিনিই একদিন আবদুল মুত্তালিবের দৌহিত্র যুহাইরের নিকট গমন করে বললেন, "কি হে

যুহাইর! তোমার কি পছন্দ হয় যে, তুমি প্রচুর পরিমাণে পানাহার করবে ও যাবতীয় আনন্দ উপভোগ করবে, আর তোমার মামার ভাগ্যে এক দানাও জটবে না।

যুহাইর বললেন, "কি করব? আমি একা, যদি আমাকে সমর্থন করবার মত একজন লোকও পেতাম, তাহলে ঐ অন্যায় চুক্তিপত্র অবশ্যই ছিড়ে ফেলতাম।" হিশাম বললেন, "আমি তোমার সাথে আছি।"

অতঃপর তারা উভয়ে মিলে মুত'ইম ইবনে আদির কাছে উপস্থিত হলেন। অপরদিকে আবুল বুখতারি ইবনে হিশাম এবং যুম'আ ইবনুল আসওয়াদও তাঁদেরকে সমর্থন দান করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। একদিন সকলে মিলে কা'বার অংগনে গমন করলেন। সেখানে যুহাইর সমবেত জনতাকে সম্বোধনপূর্বক জিজ্ঞাসা করলেন,

"হে মক্কাবাসীগণ! এটা কেমন কথা যে, আমরা সুখে-শান্তিতে দিন যাপন করব, আর বনু হাশিমদের ভাগ্যে সামান্য খাবারও জুটবে না? খোদার কসম! এই অন্যায় চুক্তিপত্র ছিঁড়ে না ফেলা পর্যন্ত আমি শান্ত হব না।" এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে আবু জাহল দাঁড়িয়ে ঘোষণা করল, "সাবধান, এই চুক্তিপত্রের বিরুদ্ধে কাকেও কিছু করতে দেয়া হবে না।" যুম'আ দাঁড়িয়ে পড়লেন, "তুমি মিথ্যাবাদী। এই চুক্তিপত্র সম্পাদনের সময় আমরা রাজি ছিলাম না।"

যুম'আর কথা শেষ হতেই আবুল বুখতারি দাঁড়িয়ে বলল, "কি ছাইভস্ম লেখা হয়েছে এতে, আমরা মোটেও খুশী নই, ওসব লেখা-টেখা আমরা মানিও না।" বুখতারি থামতেই মুতইম লাফিয়ে উঠে বলল, "তোমরা দু'জন ঠিকই বলেছ। ভিন্ন কথা যে বলবে, সে-ই হবে মিথ্যাবাদী।" হিশাম তাকে সমর্থন করল।

আবু জাহল বলল, মনে হয় তোমরা আগে-ভাগে জোট বেঁধে এসেছ।

এসব বাক-বিতন্ডার মধ্যে মুতইম লাফ দিয়ে উঠে কা'বার দেওয়াল থেকে বয়কটের দলিলটি নামিয়ে আনল ছিঁড়ে ফেলার জন্যে।

কিন্তু ছিঁড়ে ফেলতে হলো না। আল্লাহর পোকা-সৈনিকরা অনেক আগেই ধ্বংস করেছিল অন্যায় দলিলটিকে। দেখা গেল দলিলের সব শব্দ, সব কথা পোকায় খেয়ে ফেলেছে, অক্ষত রয়েছে একমাত্র 'বিসমিকা আল্লাহুম্মা' শব্দ।

মহানবী ধর্ম প্রচারের জন্য তায়েফ গমন স্থির করলেন। মহানবী ভেবেছিলেন, সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা তায়েফের মানুষের মন হয়তো আরও নরম পাওয়া যাবে।

মহানবী তায়েফ চললেন। তায়েফের প্রধান গোত্র ছিল বনু সাকিফ। আবদইয়ালিল, মাসউদ ও হাবিব নামে তিনভাই ছিল সে গোত্রের প্রধান। মহানবী প্রথমে তাদের কাছে গেলেন, আল্লাহর দ্বীনের দাওয়াত দিলেন তাদেরকে। তারা দাওয়াত তো গ্রহণ করলই না বরং তাকে নানা রকমের ব্যঙ্গ -বিদ্রূপেজর্জরিত করলো।

তারা যখন দাওয়াত কবুল করলো না, তখন মহানবী তাদেরকে নিরপেক্ষ থাকতে অনুরোধ করলেন যাতে করে তাদের মত দ্বারা সাধারণ মানুষ প্রভাবিত হতে না পারে।

কিন্তু উল্টোই করল তারা। লেলিয়ে দিল ছেলে-ছোকরা ও দাসদের। মহানবী রাস্তায় বের হলেই তারা তাঁর পেছনে পেছনে ছুটতো, ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতো, পাথর ছুড়তো।

এর মধ্যেই মহানবী সত্যের আহবান তায়েফের ঘরে ঘরে পৌছে দিতে লাগলেন। পথের দু'ধার থেকে তাঁর পা লক্ষ্য করে পাথর নিক্ষেপ করা হতে লাগলো। রক্ত রঞ্জিত হয়ে গেল তাঁর পা। চলতে না পেরে মাঝে মাঝে তিনি বসে পড়তেন। লোকরা তাঁকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আবার সেই আগের মতই পাথর নিক্ষেপ করতো। এভাবে ক্রমে তাঁর জীবন সংশয় দেখা দিল।

অবশেষে মহানবী মক্কায় ফেরার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময় অত্যাচার আরও ভীষণ আকার ধারণ করল। একদিন তারা পাথরের আঘাতে আঘাতে তাঁর দেহ জর্জরিত করে তুললো। সর্বাঙ্গ থেকে রক্তের ধারা গড়িয়ে পড়তে লাগল। এক সময় অবসন্ন হয়ে পড়ে গেলেন মহানবী। ক্লান্ত অবসন্ন দেহটা নিয়ে মহানবী ঢুকে পড়লেন একটি আংগুর বাগানে।

দেহের প্রবাহিত রক্ত জুতায় প্রবেশ করে পায়ের সাথে জমাট বেঁধে গিয়েছিল। জুতা খুলতে খুবই কষ্ট হলো তাঁর। ওযু করে মহানবী বিশ্ব-জগতের

মালিক প্রভুর উদ্দেশ্যে নামাযে তন্ময় হয়ে গেলেন। নামায শেষে প্রভুর উদ্দেশ্যে তিনি দু'টি প্রার্থনার হাত উত্তোলন করলেন। কি প্রার্থনা করলেন তিনি? তিনি কি নিজের কষ্ট লাঘবের জন্য দোয়া করলেন? নাকি তিনি তায়েফবাসীদের জন্য বদদোয়া করলেন? না তিনি এ সবের কিছুই করেননি। তিনি প্রভুর সমীপে দু'টি হাত তুলে বললেন, "হে আমার আল্লাহ, তোমাকে ডাকছি। নিজের এই দুর্বলতা, নিরুপায় অবস্থা সম্বন্ধে তোমার কাছেই অভিযোগ পেশ করছি। হে পরম দয়াময়, তুমিই যে দুর্বলের বল। প্রভুহে, তোমার সন্তোষই আমার একমাত্র কাম্য। তোমার সন্তোষ পেলে এসকল বিপদ-আপদের কোন পরওয়াই করিনা।"

মহানবী মক্কায় ফিরে চলেন। যখন তিনি তায়েফ ছাড়ছিলেন, তখন আল্লাহর নির্দেশে পাহাড়ের ফিরিশতা এসে তায়েফবাসীদেরকে পাহাড় চাপা দিয়ে মেরে ফেলার অনুমতি চাইলেন। মহানবী (সা) বললেন, 'আমি চাই তারা বেঁচে থাকুক। তাদের বংশধরগণ তো ইসলাম গ্রহণ করতে পারে।'

মহানবীর দর্শন ঘাতককে করল বিহ্বল

মহানবী হিজরাত করছেন মদীনা। চলছেন পথ ধরে। পূর্ব দিগন্ত তখনও সফেদ হয়ে উঠেনি। তিনটি উট এবং চার জন মানুষের (মহানবী, আবুবকর এবং আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকাত ছাড়াও আমের এই কাফিলায় শামিল ছিলেন।) ছোট্ট কাফিলা মদীনার পথে চলছে। আবু বকরের কাছ থেকে কেনা 'কাছওয়া' নামক উটে মহানবী, আমের এবং হযরত আবু বকর আসীন আবু বকরের উটে এবং আবদুল্লাহ ইবনে উরাইকাত তাঁর নিজস্ব উটে। দ্রুত পথ অতিক্রম করছে কাফিলাটি। ডাইনে লোহিত সাগর, বামে অন্তহীন পাহাড়ের শ্রেণী, মাঝখানের মরুপথ ধরে এগিয়ে চলছে কাফিলা।

যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও মহানবীর কাফিলা সওর গিরিগুহা থেকে বের হলে যাত্রার দৃশ্য একজন পল্লীবাসী আরবের চোখে পড়ে গেল। ঐ আরব তার গোত্রের এক জমায়েতে গিয়ে এই খবর দিয়ে বলল, 'আমার মনে হচ্ছে ওদেরকেই কুরাইশরা খুঁজছে। মহানবী ও আবু বকরকে হত্যা করতে পারলে একশ' উট পাওয়া যাবে।'– এ খবর এ পল্লীতেও এসেছিল। সুতরাং ঐ খবরটি শোনার সংগে সংগে বৈঠকে উপস্থিত সুরাকা নামক জনৈক যুবক গোটা পুরস্কার নিজে হাত করার লোভে বলল, 'না না তারা সে লোক নয়। আমি জানি তারা অমুক অমুক লোক, উট খুঁজতে বেরিয়েছে।' সুরাকার কথা সকলে সত্য বলে ধরে নিয়ে যখন অন্য আলোচনায় মশগুল হয়ে পড়ল, তখন সুরাকা ধীরে ধীরে মজলিস থেকে বের হয়ে এল। তারপর অস্ত্র–সজ্জিত হয়ে বলবান ঘোড়া নিয়ে মহানবী এবং আবু বকরকে হত্যার জন্য বেরিয়ে পড়ল।

দেরী সহ্য হচ্ছিল না সুরাকার। উঁচু নিচু পাথর পথে তীর বেগে ঘোড়া ছুটালো সুরাকা। দূরে দেখতে পেল সেই কাফিলাকে। সুরাকার ঘোড়ার গতি আরও বেড়ে গেল। কিন্তু ঘোড়া মারাত্মকভাবে পা পিছলে পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। সুরাকার মনে ভীষণভাবে খোঁচা লাগল। লক্ষ্যের সাফল্য সম্পর্কে তার মনে সন্দেহের দোলা লাগল। সে আরবীয় রীতি অনুসারে তীর দিয়ে লটারী করল। তাতে না সূচক জবাব পেয়ে সে ভীষণ দমে গেল। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্য। তারপর লটারী ভুল হয়েছে ধরে নিয়ে সে আবার তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল।

আবু বকরের সন্ধানী চোখ এই সময় সুরাকাকে দেখতে পেল। তিনি উদ্বিগ্নভাবে নবীকে বললেন, "দেখুন, আততায়ী এবার আমাদের ধরে ফেলেছে।"

নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে আবু বকরকে সান্ত্বনা দিয়ে মহানবী বললেন, "ভীত হয়ো না আবু বকর, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।"

তীর বেগে ছুটেছে সুরাকার ঘোড়া। কাফিলাকে সে ধরে ফেলেছে প্রায়। বাঁধনহীন উৎসাহ উত্তেজনায় সুরাকা তখন উন্মত্ত। চলার পথে সুরাকার ঘোড়া আবার দুর্ঘটনায় পড়ল। এবার ঘোড়ার দু'টি পা মাটিতে দেবে গেল। পা দু'টি তোলার অনেক চেষ্টা করল সুরাকা, কিন্তু পারল না। এই সময় আগের লটারীর ফল তার মনে পড়ল। মনটা তার ভীষণ দমে গেল। আবার তীর বের করে সতর্কতার সাথে সেই লটারীই পুনরায় করল। কিন্তু এবারও সেই উত্তর 'না'।

সুরাকার মন এবার ভীতি অনুভব করল। অপর দিকে মহানবীর অবিচল, নিরুদ্বিগ্ন এবং শান্ত সৌম্য অবস্থা সুরাকাকে বিহবল করে তুলল। সুরাকা নিজেই বলেছে, তখনকার অবস্থা দেখে আমার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল, মুহাম্মাদ নিশ্চয়ই জয়যুক্ত হবেন।

সুরাকা যখন ভীত-বিহবলতায় কাতর, তখন তার ঘোড়া নিজেকে উদ্ধারের জন্য অবিরাম চিৎকার করছে ও পা ছুড়ছে। এই অবস্থায় সুরাকা নবীর কাফিলাকে উদ্দেশ্য করে বলল, "হে মক্কার সওয়ারগণ, একটু দাঁড়াও। আমি সুরাকা, আমার কিছু কথা আছে, কোন অনিষ্টের ভয় নেই।"

সুরাকা অতঃপর নবীর কাছে পৌছে নিজের সব কথা খুলে বলে আরজ করল, "আমার খাদ্য সম্ভার ও অস্ত্র-শস্ত্র আপনারা গ্রহণ করুন।"

মহানবী তার দান গ্রহণ না করে মিষ্টি কথায় বললেন, 'এ সবের কোন আবশ্যকতা আমাদের নেই। আমাদের কথা কাউকে বলে না দিলেই উপকৃত হব।'

সুরাকা তখন আরজ করল, "আমার জন্য আপনি একটা পরওয়ানা লিখে দিন, যা প্রদর্শন করে আমি উপকৃত হতে পারব।" মহানবী আমেরকে বলে চামড়ায় ঐ ধরনের একটি পরওয়ানা লিখে দিলেন।

অতঃপর সুরাকা ফিরে গেল। মহানবীর কাফিলা আবার যাত্রা করল মদীনার পথে।

মদীনার পথে দানশীল ও পরহিতৈষী আবু মা'বাদের আশ্রম। ছোট তাঁবু আর একপাল মেষ নিয়ে তার সংসার। শ্রান্ত–ক্লান্ত পথিকদের তাঁরা আশ্রয় দেন। সাধ্যমত খাদ্য ও পানীয় দিয়ে পথিকদের তাঁরা সেবা করেন। মহানবীর (সা) কাফিলাও গিয়ে সেখানে হাজির হলো।

আবু মা'বাদ তখন গৃহে ছিলেন না, মেষ চরাতে গেছেন দূর প্রান্তরে।

আবু মা'বাদের স্ত্রী উম্মে মা'বাদকে জিজ্ঞাসা করা হলো, কিছু খাদ্য–পানীয় কিনতে পাওয়া যাবে কিনা।

উম্মে মা'বাদ খুবই দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, 'না,

কোন খাবার নেই। থাকলে মূল্য দিতে হতো না। আমি নিজেই ওগুলো হাজির করতাম।"

উম্মে মা'বাদের তাঁবুর পাশে শীর্ণকায় একটা ছাগী শুয়ে ছিল। মহানবী (সা) উম্মে মা'বাদকে বললেন,

"ঐ ছাগী দোহন করে দুধ নেয়া যেতে পারে কি?"

উম্মে মা'বাদ আনন্দের সাথেই বললেন, 'ছাগীটি শীর্ণ দুর্বল বলে পালের সাথে যায়নি। যদি স্তনে তার দুধ থাকে তাহলে নিতে পারেন।'

মহানবী বিসমিল্লাহ বলে দুধ দোহন শুরু করলেন। যে দুধ পাওয়া গেল তা কাফিলার সদস্যদের পরিতৃপ্তির জন্য যথেষ্ট হলো।

মহানবীসহ কাফিলার সদস্যগণ নিজেরা খেয়ে কিছুটা দুধ গৃহকর্তার জন্য রেখে দিলেন।

প্রয়োজন সেরে উম্মে মা'বাদকে ধন্যবাদ দিয়ে মহানবীর কাফিলা আবার মদীনার পথে যাত্রা করল। মহানবী (সা) চলে যাবার অল্পক্ষণ পরেই আবু মা'বাদ মেষ পাল নিয়ে বাড়ী ফিরলেন। তিনি বাটিতে টাটকা দুধ দেখে এ দুধ কোথেকে এল জিজ্ঞাসা করলেন।

উম্মে মা'বাদ মহানবীর কাফিলার আগমন, শীর্ণকায় ছাগী থেকে দুধ দোহনসহ সব ঘটনা খুলে বললেন। কাফিলার লোকদেরও বর্ণনা দিলেন উম্মে মা'বাদ। বেদুইন জীবনের মুক্ত মন নিয়ে সহজ–সাবলীল ভংগিতে মহানবীর যে বর্ণনা উম্মে মা'বাদ দিয়েছিলেন তা এখানে তুলে ধরছি।

"তাঁর উজ্জ্বল বদনকান্তি, প্রফুল্ল মুখশ্রী, অতি ভদ্র ও নম্র ব্যবহার। তাঁর উদরে স্ফীতি নেই, মস্তকে খালিত্ব নেই। সুন্দর, সুদর্শন। সুবিস্তৃত কৃষ্ণবর্ণ নয়নযুগল, কেশ দীর্ঘ ঘনসন্নিবেশিত। তাঁর স্বর গম্ভীর। গ্রীবা উচ্চ। নয়নযুগলে যেন প্রকৃতি নিজেই কাজল দিয়ে রেখেছে। চোখের পুতুলি দুইটি সদা উজ্জ্বল, ঢল ঢল। ভ্রূযুগল নাতিসূক্ষ্ম, পরস্পর সংযোজিত। স্বতঃকুঞ্চিত ঘন কেশদাম। মৌনাবলম্বন করলে তাঁর বদন মন্ডল থেকে গুরুগম্ভীর ভাবের অভিব্যক্তি হতে থাকে। আবার কথা বললে মনপ্রাণ মোহিত হয়ে যায়। দূর থেকে দেখলে কেমন মোহন কেমন মনোমুগ্ধকর সে রূপরাশি, নিকটে এলে কত মধুর কত সুন্দর তাঁর প্রকৃতি। ভাষা অতি মিষ্ট ও প্রাঞ্জল, তাতে ত্রুটি নেই, অতিরিক্ততা নেই, বাক্যগুলি যেন মুক্তার হার। তাঁর দেহ এত খর্ব নহে যা দর্শনে ক্ষুদ্রত্বের ভাব মনে আসে বা এমন দীর্ঘ নহে নয়ন যা দেখতে বিরক্তি বোধ করে, তিনি নাতিদীর্ঘ নাতিখর্ব। পুষ্টি ও পুলকে সে দেহ যেন কুসুমিত নববিটপীর সদ্য পল্লবিত নবীন প্রশাখা। সে মুখশ্রী বড় সুন্দর, বড় সুদর্শন ও সুমহান। তাঁর সঙ্গীরা সর্বদাই তাকে বেষ্টন করে থাকে। তাঁরা তাঁর কথা আগ্রহ সহকারে শ্রবণ করে এবং তাঁর আদেশ উৎফুল্ল চিত্তে পালন করে।"

স্ত্রীর মুখে এই বর্ণনা শুনে আবু মা'বাদ উত্তেজিত স্বরে বলে উঠলেন, "আল্লাহর শপথ, ইনি নিশ্চয় কুরাইশদের সেই ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে আমরা সত্য-মিথ্যা অনেক কিছু শ্রবণ করেছি। হায় আমার অদৃষ্ট, আমি অনুপস্থিত ছিলাম। উপস্থিত থাকলে আমি তাঁর আশ্রয় নিতাম, আমি বলছি, সুযোগ পেলে এখনও তা করব।"

মহানবী (সা) মক্কা থেকে মদীনায় হিজরাত করছেন। তিনি চলেছেন মদীনার পথে।

কুরাইশদের ঘোষিত একশ' উট পুরস্কারের খবর মদীনা পর্যন্ত রাস্তার সবখানেই পৌছে গেছে। মদীনার পথে আসলাম গোত্রের গোত্রপতি বুরাইদা তার ৭০ জন দুর্ধর্ষ যোদ্ধা নিয়ে প্রস্তুত হয়ে বসে আছে। মহানবীর কাফিলা যখন সেখানে পৌছল, খবর পেয়ে তারা ছুটল।

চার জনের ছোট কাফিলা চলছে। পিছনে ছুটে আসছে অস্ত্রসজ্জিত ৭০ জন দুর্ধর্ষ লোকের একটি দল। জাগতিক বিচারে কাফিলাটি একেবারেই অসহায়। মহানবী ও আবু বকর ছাড়া অপর যে দু'জন সাথী আছেন তারা অমুসলমান। চার জনের কারো কাছেই কোন অস্ত্র নেই। এমন একটা অবস্থায় কাফিলাটি এখন শত্রুর হাতের মুঠোর মধ্যে। কাফিলার অপর সদস্যগণ উদ্বেগ আশংকায় মুহ্যমান। কিন্তু মহানবীর মুখে কোনই ভাবান্তর নেই, আসন্ন মহা বিপদের সামান্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশও মহানবীর চেহারা মুবারকে নেই। তিনি কুরআন শরীফ পাঠ করছেন। কুরআনের সুমধুর ধ্বনি তার কণ্ঠ থেকে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে।

আসলাম গোত্রপতি বুরাইদা তার ৭০ জন খুনপিয়াসি সাথী নিয়ে ছুটে আসছেন কাফিলার দিকে। ১শ' উট পুরস্কার তাদের হাতের মুঠোয়। তাদের রক্তে তখন আনন্দ উত্তেজনার তান্ডব নৃত্য। তাদের হাতের উলংগ তরবারি ও বর্শা সূর্যকিরণে ঝলমল করছে।

বুরাইদার দল ক্রমশঃ মহানবীর ছোট কাফিলার নিকটবর্তী হচ্ছে। যতই তারা নিকটবর্তী হচ্ছে, মহানবীর মুখ নিঃসৃত কুরআনের স্বর্গীয় সুর লহরী তাদের কানে কানে ছড়িয়ে পড়ছে। কান থেকে তা প্রবেশ করছে মন ও মগজে। তাদের কাছে অদ্ভুত মোহনীয় লাগছে অশ্রুতপূর্ব আয়াতসমূহের ভাব, ভাষা ও ছন্দ। মর্মে মর্মে তা যেন দাগ কেটে বসে যাচ্ছে। বুরাইদা কাফিলার যতই নিকটবর্তী হচ্ছে, ততই তার পা দু'টি ভারী হয়ে উঠছে, বাহু যুগল যেন শিথিল হয়ে পড়ছে। লোভাতুর রক্তের সেই তান্ডব নৃত্য যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। এই অবস্থাতেই বুরাইদা তার দলসহ মহানবীর কাছাকাছি এসে পড়লো।

কুরআন তেলাওয়াত বন্ধ করলেন মহানবী। তারপর বুরাইদার দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মধুর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আগন্তুক, তুমি কে, কি চাও?'

'আমি বুরাইদা, আসলাম গোত্রপতি' বুরাইদা জবাব দিল।

'ভালো কথা।' বললেন মহানবী।

'আর আপনি কে?' জিজ্ঞাসা করল বুরাইদা।

'আমি মক্কার অধিবাসী আবদুল্লাহ্‌র পুত্র মুহাম্মাদ, সত্যের সেবক, আল্লাহ্‌র রাসূল,' উত্তর দিলেন মহানবী।

আসলাম গোত্রপতি বুরাইদা মহানবীর সাথে কথা বলে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ভাব বিহবলতায় আত্মহারা হয়ে পড়ল। মাটিতে বসে পড়ল বুরাইদা। তার শিথিল হাত থেকে বর্শা দন্ড খসে পড়ল। তার সংগীদেরও এই অবস্থা। অভিভূত বুরাইদা মহানবীর পায়ে লুটিয়ে পড়ল।

মহানবী তাকে সান্ত্বনা দিলেন। সান্ত্বনা দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করতে গেলেন কাফিলার।

বুরাইদা সম্বিত ফিরে পেল। সে মহানবীকে কাতর কণ্ঠে বলল। 'একবার যখন ও চরণে আশ্রয় দিয়েছেন, তা থেকে আর আমাদের বঞ্চিত করবেন না' বলেই সে উঠে দাঁড়ালো। গিয়ে দাঁড়ালো কাফিলার অগ্রভাগে। নিজের মাথার পাগড়ি খুলে বর্ষার মাথায় গেঁথে পতাকা উড্ডীন করলো বুরাইদা। এটাই বোধ হয় ইসলামের প্রথম পতাকা।

মহানবীর পিছনে ৭০ খানা উলংগ তরবারী, ৭০ খানা বর্শা সূর্যের আলোয় ঝলমল করতে লাগল। কাফিলা যাত্রা শুরু করল। পতাকা দুলিয়ে বুরাইদা আগে আগে চলছিলো।

ইসলামের জন্য অনুকূল মদীনা মুনাওয়ারায় হিজরাতের স্থির সিদ্ধান্ত হয়ে যাওয়ার পর মহানবী (সা) মক্কার মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন চুপে চুপে একে একে হিজরাত করার জন্যে। মহানবীর (সা) এ নির্দেশ পাবার পর সবাই অত্যন্ত গোপনে হিজরাতের জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। কিন্তু কথাটা গোপন থাকলো না। শিকারগুলো যাতে পালাতে না পারে সেজন্য বিধর্মী কুরাইশরা সতর্ক হয়ে গেল। এর মধ্যেই মুসলমানরা একা একা অথবা একাধিকজন মিলে বাড়ী-ঘর, সহায়-সম্পত্তি সব ফেলে মদীনায় হিজরাত করতে লাগলেন।

উম্মে সালামা এবং তাঁর স্বামী আবু সালামা হৃদয় বিদারক এক পরীক্ষার সম্মুখীন হলেন হিজরাতের সময়। উম্মে সালামার পিতার গোত্রের লোকরা এসে উম্মে সালামাকে কেড়ে নিয়ে যেতে চাইল, আর আবু সালামার গোত্রের লোকেরা এসে আবু সালামার দুগ্ধপোষ্য আদরের শিশুকে কেড়ে নিল। স্ত্রী ও শিশুর কান্নায় এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের সৃষ্টি হলো। সব কান্না উপেক্ষা করে আবু সালামার স্ত্রী ও শিশুকে কুরাইশরা কেড়ে নিয়ে গেল। ক্রন্দনরত আবু সালামার ঈমানই কিন্তু সবার উপর বিজয়ী হলো। তিনি চোখ দু'টি মুছে মদীনার পথে যাত্রা করলেন।

আবু সালামা চলে যাবার পর উম্মে সালামার চোখের পানি কোনদিন শুকায়নি। এক বছর পর আত্মীয় স্বজনের মন নরম হলো। তারা শিশুসহ উম্মে সালামাকে এক উটে তুলে দিলো। একমাত্র ঈমানের শক্তি সম্বল করে উম্মে সালামা মদীনার পথে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে দেখা হলো উসমান ইবনে তালহার সাথে। তিনি সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সাথে আর কে আছে?' উম্মে সালামা উত্তরে বললেন, 'এই শিশু আর আল্লাহ'। উত্তর শুনে উসমান ইবনে তালহা বলেছেন, তার বুক কেঁপে উঠল। তিনি উম্মে সালামাকে মদীনা পৌঁছে দিলেন।

ইসলামের প্রথম জুমআর প্রথম খুতবা

দীর্ঘ দুই সপ্তাহ ধরে সীমাহীন ব্যাকুলতা নিয়ে মদীনাবাসী অপেক্ষা করছেন মহানবীর (সা) জন্য। মহানবীর (সা) মদীনা প্রবেশের খবর মদীনায় ছড়িয়ে পড়ার পর সাজ সাজ রব পড়ে গেল মদীনার ঘরে ঘরে মহানবীকে (সা) স্বাগত জানাবারজন্য।

সেদিন ছিল শুক্রবার। মহানবী কুবা পল্লী থেকে মদীনা যাত্রা করলেন। তাঁর সামনে পেছনে ডানে বামে মুসলিম জনতার সারিবদ্ধ মিছিল। সবার মুখে আল্লাহু আকবার ধ্বনি। মহানবী বনু সালেম গোত্রের কাছে পৌছলেন, তখন জুমআর নামাযের সময় হলো। মহানবী জুমআর নামাযের আয়োজনের নির্দেশ দিলেন। সেখানে জুমআর নামায অনুষ্ঠিত হলো। ইসলামের প্রথম জুমআর নামায এটাই। মহানবী জুমআর নামাযে যে খুতবা দিলেন, সেটা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম খুতবা। সে ঐতিহাসিক খুতবায় মহানবী বললেন–

"সকল মহিমা সকল গরিমা একমাত্র আল্লাহর। তাঁরই মহিমা কীর্তন করি, তাঁরই সাহায্য প্রার্থনা করি, তাঁরই নিকটে ক্ষমা ভিক্ষা করি এবং সৎপথ চিনবার শক্তি তাঁর নিকটই যাচঞা করি। তাঁর প্রতিই ঈমান আনবো এবং তাঁর আদেশ অমান্য করবো না। যে তাঁর বিদ্রোহী তাকে আপনার বলে মনে করবো না।

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ ইলাহ নেই, এবং এও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও প্রেরিত রাসূল। যখন দীর্ঘকাল পর্যন্ত জগত রাসূলের উপদেশ থেকে বঞ্চিত ছিল, যখন জ্ঞান জগৎ থেকে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল, যখন মানবজাতি ভ্রষ্টতা ও অনাচারে জর্জরিত হচ্ছিল, তাদের মৃত্যু ও কঠোর কর্মফল ভোগের সময় যখন নিকটবর্তী হয়ে আসছিল এহেন সময় আল্লাহ সেই রাসূলকে সত্যের আলো ও জ্ঞান দিয়ে বিশ্ববাসীর নিকট প্রেরণ করেছেন।

আল্লাহর ও তাঁর রাসূলের অনুগত হয়ে চললেই মানব–জীবনের চরম সফলতা লাভ হবে। পক্ষান্তরে তাঁদের অবাধ্য হলে ভ্রষ্ট, পতিত ও পথহারা হয়ে পড়তে হবে।

সকলে নিজকে এমনভাবে গঠিত ও সংশোধিত করে নাও, যেন পাপজনিত কাজের প্রবৃত্তিই তোমাদের হৃদয় থেকে চিরতরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। তোমাদের প্রতি এই আমার চরম উপদেশ। পরকাল চিন্তা ও তাকওয়া অবলম্বন করা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপদেশ এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে দিতে পারে না। যে সব দুষ্কর্ম থেকে আল্লাহ তোমাদের বিরত থাকতে আদেশ করেছেন, সাবধান, তার নিকটেও যেও না। এই-ই হচ্ছে উৎকৃষ্টতম উপদেশ, এই-ই হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম জ্ঞান।

আল্লাহ সম্পর্কে তোমার কর্তব্য আছে। তাঁর সাথে তোমার যে সম্বন্ধ আছে, তুমি তা ভুলে যেও না। সে ব্যাপারে যেখানে যে ত্রুটি ঘটে যায়, তুমি প্রকাশ্যে ও গোপনে তার সংশোধন কর, তোমার সে সম্বন্ধকে তুমি দৃঢ় ও নিখুঁত করে নাও– এই হচ্ছে জ্ঞান এবং পরজীবনের চরম সম্বল।

স্মরণ রেখো, এর অন্যথা করলে, তোমরা কর্মফলের সম্মুখীন হতে ভীত হলেও তার হাত থেকে ছাড়া পাবার উপায় নেই। আল্লাহ প্রেমময় ও দয়াময়, তাই এই কর্মফলের অপরিহার্য পরিণামের কথা পূর্ব থেকেই তোমাদের জানিয়ে সতর্ক করে দিচ্ছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের কথাকে সত্যে পরিণত করবে, কার্যত নিজের প্রতিজ্ঞা পালন করবে, তার সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন, "আমার বাক্যের রদবদল নেই এবং মানবের প্রতি অত্যাচারীও নই।" অতএব তোমরা মুখ্য ও গৌণ, প্রকাশ্য ও গুপ্ত সব বিষয়েই তাকওয়ার সন্ধান কর। তাকওয়াই পরম ধন, তাকওয়াতেই মানবতার চরম সাফল্য।

সঙ্গত ও সংযতভাবে পৃথিবীর সকল সুখ উপভোগ কর, তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিতাব দিয়েছেন, তাঁর পথ দেখিয়েছেন। এখন কে প্রকৃতপক্ষে সত্যের সেবক আর কে কেবল মূর্খের দাবীসর্বস্ব মিথ্যাবাদী তা জানা যাবে। অতএব আল্লাহ যেমন তোমাদের মঙ্গল করেছেন, তোমরাও সেরূপ আল্লাহর মঙ্গল সাধনে প্রবৃত্ত হও, আল্লাহর শত্রু– পাপাচারকারীদেরকে শত্রু বলে জ্ঞান কর "এবং আল্লাহর নামে যথাযথ জিহাদে প্রবৃত্ত হও। (এই কাজের জন্য) তিনি তোমাদের নির্বাচিত করে নিয়েছেন এবং তিনি তোমাদের নাম রেখেছেন 'মুসলিম'।" (কুরআন) কারণ (নিজের কর্মফলে ও প্রকৃতির অপরিহার্য বিধানে) যার ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী, সে সত্য, ন্যায় ও যুক্তি মতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হোক। আর যে জীবন লাভ করবে, সে সত্য, ন্যায় ও যুক্তি সহায়তায় জীবনলাভ করুক। নিশ্চয় জেন, আল্লাহ ব্যতীত আর কোন শক্তি নেই।

অতএব, সদা–সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ কর, আর পরকালের জন্য সম্পদ সঞ্চয় করে নাও। আল্লাহর সাথে তোমার সম্বন্ধ কি, এ যদি তুমি বুঝতে পার, বুঝে নিয়ে তাকে দৃঢ় ও নিখুঁত করে নিতে পার, তাঁর প্রেম স্বরূপে সম্পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে আত্মনির্ভর করতে পার, তাহলে তোমার প্রতি মানুষের যে ব্যবহার তার ভার তিনিই গ্রহণ করবেন। কারণ মানুষের উপর আল্লাহরই আজ্ঞা প্রচলিত হয়, আল্লাহর উপর মানুষের হুকুম চলে না, মানব তার প্রভু নয়, কিন্তু তিনি তাদের প্রভু। আল্লাহু আকবর, সেই মহিমান্বিত আল্লাহ ব্যতীত আর কারও হাতে কোন শক্তি নেই।”

ইহুদীদের কাছে মহাপুরুষ এক নিমিষে হন পাষন্ড

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মদীনার ইহুদী সমাজের প্রধানতম পন্ডিত। তিনি সেখানকার ইহুদী সমাজের অসীম ভক্তিশ্রদ্ধার পাত্র। তিনিও উদগ্রীবভাবে মহানবীর প্রতিক্ষা করছিলেন।

মহানবী মদীনায় পৌছলে তিনি তাঁর সাথে দেখা করতে গেলেন। মহানবী তখন কয়েকজন সাহাবীকে উপদেশ দিচ্ছিলেন। তিনি বলছিলেন, "সকলকে শান্তি ও প্রেমপূর্ণ সম্বোধন কর। সকলকে খেতে দাও এবং নির্জন নিস্তব্ধ নিশীথে যখন সমস্ত লোক ঘুমিয়ে থাকে তখন নামাযে লিপ্ত হও।"

আবদুল্লাহ ইবনে সালাম বলেছেন "নবীর মুখ দেখেই আমার মন যেন বলে উঠল, এ কোন ভন্ড ও মিথ্যাবাদীর মুখ নয়।"

পরে আবদুল্লাহ মহানবীর সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করলেন। ধর্মতত্ত্ব সংক্রান্ত কয়েকটা জটিল প্রশ্ন উত্থাপন করতঃ তার মীমাংসা করে দিতে বললেন। মহানবী সংক্ষেপে কয়েকটা কথায় সে প্রশ্নগুলোর এমন সুন্দর ও সন্তোষজনক সমাধান করে দিলেন যে, আবদুল্লাহর যুগ-যুগান্তের জটিল যুক্তিতর্ক ও কুটিল দার্শনিকতা জর্জরিত হৃদয়ে অভিনব প্রশান্তির উদ্রেগ হলো। ভক্তিতে তাঁর অন্তরটা নুয়ে পড়ল। তারপর তাওরাতে বর্ণিত লক্ষণের সাথে মহানবীকে মিলিয়েও নিলেন তিনি। অতঃপর নিজের গোত্র, নিজের জাতি ইহুদী সমাজ-কারও অপেক্ষা না করে তিনি ঘোষণা করলেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনও ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ (সা) তাঁর রাসূল।'

ইসলাম গ্রহণের পর আবদুল্লাহ ইবনে সালাম মহানবীর কাছে নিবেদন করলেন, 'ইহুদীরা আমাকে তাদের প্রধান পন্ডিত ও সমাজপতি বলে বিশ্বাস করে থাকে। আমার পিতা সম্বন্ধেও তাদের এ বিশ্বাস ছিল। আমার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ না করে ইহুদীদের ডেকে আমার কথা জিজ্ঞেস করুন।'

মহানবী ইহুদীদের ডাকলেন। ডেকে তাদের ইসলামের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু তারা তা গ্রহণ করল না। তখন মহানবী তাদের আবদুল্লাহ ইবনে সালাম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন। তারা এক বাক্যে বলল, "তিনি মহাপুরুষের বংশধর, নিজেও মহাপুরুষ এবং তিনি মহাপন্ডিতের বংশধর, নিজেও একজন মহাপন্ডিত। তিনি আমাদের সরদার পুত্র সরদার।"

মহানবী তখন তাদের বললেন, "আচ্ছা, আবদুল্লাহ যদি আমাকে সত্য নবী বলে স্বীকার করেন এবং তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন।" ইহুদীরা বলে উঠল "সর্বনাশ, তা কি কখনও সম্ভব?"

তখন নবীর আহবানে আবদুল্লাহ আড়াল থেকে বের হয়ে এলেন এবং সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "তোমরা সকলেই জেনেছ যে, ইনি আল্লাহর সত্য রাসূল, তাঁকে স্বীকার কর মুক্তি পাবে।"

আবদুল্লাহর এই কথা শুনে এক মুহূর্তে ইহুদীদের সুর পাল্টে গেল। তারা বলল, "আমরা প্রথমে ঠিক কথা বলিনি, আবদুল্লাহ একজন ভীষণ পাঁজী, ভয়ানক পাষন্ড সে। তার চৌদ্দ পুরুষও পাষন্ড, ইত্যাদি।"

মেহমানের মর্যাদা পেলো যুদ্ধবন্দীরা

বদর যুদ্ধে বিজয়ী মুসলমানদের হাতে অনেক কুরাইশ বন্দী হলো। এরা সেই তারা, যারা মহানবী (সা) এবং তাঁর অনুসারীদের উপর তের বছর ধরে অমানুষিক অত্যাচার করেছে এবং তাঁদেরকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করেছে। সেই যুগের নীতি অনুসারে হয় তাদের সকলকে হত্যা অথবা তাদেরকে দাস বানিয়ে নেয়া যেত। কিন্তু মহানবী (সা) তাদের সাথে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবহার করলেন।

তিনি তাদের সাথে মেহমানের মত ব্যবহার করতে নির্দেশ দিলেন। মুসলমানদের নিজেদের খাওয়ার ব্যাপারে কষ্ট হলেও বন্দীদের ভাল এবং পেট পুরে খাবার দেয়া হতো। মুসলমানরা দু'চারটা খেজুর খেয়ে দিন কাটাতেন, কিন্তু বন্দীদের রুটি খাওয়ান হতো। বন্দীদের একজন পরবর্তীকালে বলেছেন, "মদীনাবাসীদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ওরা আমাদের ঘোড়ায় চড়িয়ে নিজেরা পায়ে হেঁটে পথ চলত। তারা প্রায় না খেয়ে আমাদের খাওয়াতো।"

ওয়াহাবের আমল দেখে উমার (রা) ঈর্ষান্বিত হলেন

ওয়াহাব ইবনে কাবুস (রা) একজন সাহাবী। তিনি একটি গ্রামে বাস করতেন এবং বকরি চরাতেন।

একদিন তিনি নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রের ছাগলের সাথে নিজের ছাগলগুলো বেঁধে দিয়ে ছাগলগুলো ঐখানে ফেলে মদীনা শরীফ চলে গেলেন। সেখানে নবী করীম (সা) কে সন্ধান করে জানতে পারলেন, নবী করীম (সা) উহুদের যুদ্ধে চলে গেছেন। তিনি অতি দ্রুত গিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে হাযির হলেন।

তিনি পৌছার পরই একদল কাফির নবী করীম (সা)কে আক্রমণ করল। হযরত ওয়াহাব (রা) তখন ক্ষিপ্রতার সাথে এবং অমিতবিক্রমে তরবারি চালাতে লাগলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে শত্রুদের হটিয়ে দিলেন। একটু পর আরেক দল নবী করীম (সা) কে আক্রমণ করল। এবারও হযরত ওয়াহাব শত্রুদের হটিয়ে দিলেন। এবার তৃতীয় দল আক্রমণ করল। নবী করীম (সা) তখন হযরত ওয়াহাবকে জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন। বলার সাথে সাথে হযরত ওয়াহাব শত্রু দলটির উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু শ্রান্তক্লান্ত বীর এবার শহীদ হয়ে গেলেন।

সা'আদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস বলেন যে, ওয়াহাব (রা) সেদিন যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, কোন যোদ্ধাকে তিনি কখনও অমন সাহস ও বীরত্ব প্রদর্শন করতে দেখেননি।

ওয়াহাবের শাহাদাতের পর নবী করীম (সা) তাঁর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট, আল্লাহও তোমার উপর সন্তুষ্ট হোন।

এরপর নবী করীম (সা) সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে থাকলেও নিজের পবিত্র হাতে ওয়াহাবকে দাফন করলেন। হযরত উমার (রা) বলেন, কারো আমল দেখে আমি কখনও ঈর্ষান্বিত হইনি। কিন্তু ওয়াহাবের আমল দেখে আমি বাস্তবিকই ঈর্ষান্বিত হয়েছিলাম। এমন আমলনামা নিয়ে যদি আল্লাহর নিকট যেতে পারতাম।

উমায়ের (রা) যুদ্ধ রেখে খেজুর খেলেন না

বদরের যুদ্ধে নবী করীম (সা) একটি তাঁবুতে কিছুক্ষণ বিশ্রাম শেষে বাইরে এসে বললেন, 'উঠ এবং আসমান যমীনের চাইতে বড় এবং মুত্তাকীদের জন্যে তৈরী জান্নাতের দিকে অগ্রসর হও।'

হযরত উমায়ের ইবনুল হাম্মাম এই কথা শুনে বলে উঠলেন, বাঃ বাঃ!

নবী করীম (সা) বললেন, 'তুমি তাদের একজন।'

এরপর সাহাবী উমায়ের (রা) ঝুলি থেকে খেজুর বের করে খেতে লাগলেন। কিন্তু পর মুহূর্তেই বলতে লাগলেন, 'খেজুর খাওয়ার জন্যে অপেক্ষা। হাতে তো অনেক খেজুর রয়েছে, এতক্ষণ কে অপেক্ষা করবে?' এই বলে উমায়ের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে শত্রুর মধ্যে ঢুকে পড়লেন এবং যে পর্যন্ত না শহীদ হলেন সে পর্যন্ত অনবরত অসি চালনা করলেন।

মহানবী (সা) ও মুসলিমদের প্রতি এক শহীদের বাণী

উহুদের যুদ্ধে নবী করীম (সা) হযরত সা'দ ইবনে রাবী কেমন আছেন জানতে না পেরে একজন সাহাবীকে তাঁর সন্ধানে পাঠালেন। তিনি প্রথমে শহীদদের মধ্যে তাকে তালাশ করলেন, না পেয়ে জীবিতদের মধ্যে ডেকে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু নিরাশ হয়ে বললেন, সা'দ ইবন রাবীর সংবাদ লওয়ার জন্যে নবী করীম (সা) আমাকে পাঠিয়েছেন।

তখন এক স্থান হতে একটি অতি ক্ষীণ স্বর শোনা গেল। তিনি ঐ স্বর লক্ষ্য করে গিয়ে দেখলেন, সা'দ নিহতদের মধ্যে পড়ে আছেন এবং জীবনের এক আধটি নিঃশ্বাস মাত্র তাঁর বাকী আছে।

সাহাবী নিকটে গেলে হযরত সা'দ বললেন, নবী (সা)কে সালাম জানিয়ে বলো, আল্লাহ তা'আলা কোন নবীকে তাঁর উম্মাতের তরফ থেকে শ্রেষ্ঠতম যে পুরস্কার দান করেছেন, আল্লাহ যেন আমার তরফ থেকে তাঁকে তার চেয়ে উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর মুসলমানদের আমার এ বাণী পৌছিয়ে দিও যে, তাদের একটি প্রাণী জীবিত থাকতে যদি কাফিররা নবী করীম (সা) এর নিকটে আসতে পারে, তবে তাদের মুক্তির জন্যে আল্লাহর কাছে কোন ওযরই থাকবে না। এ কথা বলেই তিনি শহীদ হয়ে গেলেন।

সা'দ জিহাদের ডাক শুনে বিয়ের কথা ভুলে গেলেন

হযরত সা'দ। কোন মেয়েই তাকে বিয়ে করতে রাজী হয় না। হয়ত তাঁর প্রচুর অর্থ বা দৈহিক সৌন্দর্য ছিল না। অবশেষে তিনি নবীর (সা) শরণাপন্ন হলেন। নবী (সা) তাঁর বিয়ে ঠিক করে দিলেন। মনের আনন্দে সা'দ ছুটে গেলেন বাজারে যথাশক্তি অর্থ ব্যয়ে বিয়ের জিনিসপত্র কিনতে। বাজারে গিয়েই সা'দ শুনতে পেলেন 'জিহাদ,' জিহাদে কে যোগ দেবে, সত্যের পথে, আল্লাহর পথে কে প্রাণ দেবে। সা'দ এই আহবান শুনলেন। বিবাহিত জীবনের সকল স্বপ্নসাধ তাঁর মুহূর্তে ভেঙ্গে গেল। জিহাদের আহবান এসেছে– সত্যের জন্য প্রাণ দিতে ডাক এসেছে– সা'দ অধীর হয়ে উঠলেন। বিয়ের জিনিসপত্র না কিনে তিনি খরিদ করলেন একটি ঘোড়া, বর্শা ও একটি সুদীর্ঘ তরবারি। ছুটে চললেন যুদ্ধক্ষেত্রে। অসীম সাহস, উৎসাহ ও বীর্যবত্তা দেখিয়ে সা'দ যুদ্ধ করে শহীদ হলেন। যে সা'দ চেয়েছিলেন বিবাহের রাতে কনেকে যৌতুক দেবেন, আনন্দের প্রীতি উপহার দেবেন, সেই সা'দ সূর্যাস্তের পূর্বেই আল্লাহকে তাঁর জীবন উপহার দিলেন– এক অপূর্ব যৌতুক।

জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পর মহানবী শত্রুদেরই মঙ্গল চাইলেন

উহুদের যুদ্ধক্ষেত্র। মহানবী (সা) স্বয়ং সৈনিকদের ব্যূহ সাজিয়েছেন। পাহাড়ের গলিপথে পাহারা বসিয়েছিলেন এবং যার যা দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু প্রাথমিক বিজয় মুসলিম সৈনিকদের আত্মহারা করে দিয়েছিল, দায়িত্বের কথা তারা ভুলে গিয়েছিল। পাহাড়ের গলিপথ রক্ষার দায়িত্ব যাদের উপর ছিল, তারা সরে এসেছিল সেখান থেকে। ফলে পেছন থেকে আক্রান্ত হওয়ায় বিপর্যয় নেমে আসে মুসলিম বাহিনীতে।

অনেক সাহাবী শহীদ হলেন। আহত হলেন আরও অনেক। স্বয়ং মহানবী (সা) ম্যরাত্মকভাবে আহত হলেন। পাথরের আঘাতে তাঁর কপালে গভীর ক্ষতের সৃষ্টি হলো। লৌহ শিরস্ত্রাণ তাঁর ঢুকে গিয়েছিল সেই ক্ষতে। দাঁতও তাঁর ভেঙ্গে গিয়েছিল। তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।

পাহাড়ের এক চূড়ায় সাহাবীরা তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছিল। তিনি জ্ঞান ফিরে পেয়ে চোখ খুলে চাইলেন। রক্ত মুছে ফেললেন মুখমন্ডল থেকে। তারপর তিনি প্রথম যে কথা বললেন তা ছিল এই,

"হে আল্লাহ, আমার লোকদের সত্য পথে ফিরিয়ে আনুন। তারা জানে না তারা কি করছে।"

হুদাইবিয়া সন্ধির শর্তগুলো স্থির হয়েছে, কিন্তু স্বাক্ষর তখনও হয়নি। এমন সময় মক্কার একজন মুসলমান পালিয়ে হুদাইবিয়ায় মুসলমানদের কাছে পৌঁছল। নাম আবু জান্দাল। সে ইসলাম গ্রহণ করায় মক্কাবাসীরা তার ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে আসছে। হুদাইবিয়ায় মুসলমানদের আসার কথা শুনে সে বন্দীদশা থেকে কোন রকমে পালিয়ে এসেছে। তার দেহে নির্মম আঘাতের চিহ্নগুলো জ্বলজ্বল করছে। সে মহানবী (সা)–এর কাছে আশ্রয়ের আবেদন জানাল।

মহানবীর দরবারে উপস্থিত কুরাইশ নেতা সাহল বলল, 'সন্ধির শর্ত অনুযায়ী এই লোককে অবিলম্বে মক্কায় ফেরত পাঠাতে হবে।' উত্তরে একজন মুসলিম বলল 'সন্ধি এখনও স্বাক্ষর হয়নি, সুতরাং এ লোককে ফেরত দিতে এখনই আমরা বাধ্য নই।' সাহল বলল, 'যদিও সন্ধি এদিক থেকে অসম্পূর্ণ তবু সন্ধির শর্ত সম্পর্কে আমরা একমত হয়ে গেছি। সুতরাং লোকটিকে অবশ্যই আমাদের হাতে ফেরত দিতে হবে।'

মহানবী (সা) গম্ভীরভাবে বসেছিলেন, অবশেষে তিনি সাহলকে বললেন, 'ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে।'

তারপর তিনি আবু জান্দালের দিকে স্নেহদৃষ্টি তুলে বললেন, 'আবু জান্দাল, ফিরে যাও, আল্লাহর নামে ধৈর্য ধারণ কর। আল্লাহই তোমার মুক্তির একটা ব্যবস্থাকরবেন।'

ক্রন্দনরত আবু জান্দাল মুসলমানদের সামনে দিয়ে মক্কায় চলে গেল। তার কান্না অস্থির করে তুলল মুসলমানদের।

উমার (রা) আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি মহানবীর (সা) সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। অদম্য আবেগে গোটা দেহ কাঁপছিল তাঁর। বললেন, 'হে রাসূল, আপনি কি আল্লাহর সত্যিকার রাসূল নন?'

মহানবী (সা) বললেন, 'নিশ্চয় আমি আল্লাহর রাসূল।' উমার (রা) বললেন, 'আমরা হকের উপর আছি, তারা নাহক পথে আছে এটা কি সত্য?'

মহানবী (সা) বললেন, 'অবশই সত্য।' উমার (রা) বললেন, 'তাহলে কেন আপনি অপমানকর সন্ধির অমর্যাদাকেই ধরে রাখতে চাইছেন? আমার আবেদন,

সন্ধির শর্ত থেকে আমাদের মুক্তি দিন। তলোয়ারই ফায়সালা করুক।'

মহানবী (সা) হেসে বললেন, 'কিন্তু উমার, আমি যে শান্তির বার্তাবাহক। ধৈর্য ধর। তুমি যাকে অমর্যাদাকর বলছ, তার মধ্যেই করুণাময় আল্লাহ এক মহাপুরস্কার লুক্কায়িত রেখেছেন, যা সামনেই দেখতে পাবে' এই বলে মহানবী (সা) সন্ধিপত্রে তাঁর সীলমোহর লাগালেন এবং তা তুলে দিলেন সাহল-এর হাতে।

একটা খেজুর মহানবীকে রাতে ঘুমাতে দিলনা

মহানবী (সা) বিত্তের মধ্যে থেকেও ছিলেন নিঃস্ব। এক বিশাল সাম্রাজ্যের মালিক হয়েও তিনি ছিলেন দরিদ্র। মৃত্যুর দিন তাঁর গৃহাঙ্গন ছিল অন্ধকার, বাতিতে তেল ছিলনা। ভাঁড়ারে কোন খাবার ছিলনা, ঋণের দায়ে তাঁর বর্মটি ছিল বন্ধক দেয়া।

তিনি নিঃস্ব ছিলেন কারণ রাষ্ট্রের সম্পত্তি অর্থাৎ জনগণের সম্পদে তিনি হাত দিতেন না।

সাদাকা জাতীয় দানকে তিনি নিজের জন্যে হারাম মনে করতেন।

একদিনের ঘটনা। একদিন রাতে মহানবী (সা)-কে নিদ্রাহীন দেখা গেল। তিনি অশান্তভাবে বিছানায় গড়াগড়ি দিচ্ছিলেন।

তাঁর সহধর্মিনী জিজ্ঞেস করলেন, "হে আল্লাহর রাসূল, সারা রাত আপনি ঘুমোননি।"

মহানবী (সা) উত্তরে বললেন, "আমি পথে এক জায়গায় একটা খেজুর পেয়ে তুলে নিয়েছিলাম এবং খেয়ে ফেলেছিলাম এই ভেবে যে, হয়তো ওটা পচে নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু এখন আমার ভয় হচ্ছে খেজুরটা যদি সাদাকার জিনিস হয়ে থাকে?"

আবুবকর (রা) তাঁর অতুলনীয় বিশ্বাসপরায়ণতার জন্যে উপাধি পেয়েছিলেন "আস্ সিদ্দিক"।

শুধু বিশ্বাস ও আমলেই নয়, দানশীলতার ক্ষেত্রেও তাঁর কোন তুলনা ছিলনা।

উমার ইবনে খাত্তাব (রা) বলেছেন, "তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে মহানবী (সা) আমাদের যার যা আছে তা থেকে যুদ্ধ তহবিলে দান করার আহবান জানালেন। এ আহবান শুনে আমি নিজে নিজেকে বললাম, "আমি যদি আবু বকরকে অতিক্রম করতে পারি, তাহলে আজই সেই দিন।" এই চিন্তা করে আমি আমার সম্পদের অর্ধেক মহানবীর (সা) খেদমতে হাজির করলাম। আল্লাহর রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, "পরিবারের জন্য তুমি কি রেখেছে?" বললাম, "যেই পরিমাণ এনেছি সেই পরিমাণ রেখে এসেছি।" এরপর আবুবকর তাঁর দান নিয়ে হাযির হলেন। মহানবী ঠিক ঐভাবেই তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আবুবকর, পরিবারের জন কি অবশিষ্ট আছে?" অবুবকর জবাব দিলেন, "তাদের জন্য আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূল রয়েছেন।" আমি আমার কানকে আগের মত করেই বললাম, "কোন ব্যাপারেই আবুবকরকে কোন দিন ছাড়িয়ে যেতে পারবোনা।"

সমগ্র আরব তখন মহানবীর (সা) করতলে। প্রভূত সম্পদ তখন জমা হয়েছে মদীনার নববী রাষ্ট্রে।

এমনি একদিন মহানবীর (সা) একমাত্র জীবিত সন্তান আদরের দুলালী ফাতিমা (রা) এলেন তাঁর কাছে।

মহানবী (সা) দাঁড়িয়ে দু'হাত বাড়িয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। সস্নেহে তাঁকে পাশে বসালেন। রুমাল দিয়ে মেয়ের মুখের ঘর্মবিন্দু মুছে দিলেন। তারপর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন মেয়ের।

কুশল বিনিময়ের পর ফাতিমা (রা) বিষণ্নভাবে বললেন, 'আব্বাজান, অনেক লোক আমার বাড়িতে। আমরা দু'জন, তিন ছেলে, চারজন ভাতিজা এবং অতিথিদের স্রোত। আমাকে একাই রান্নাবান্না করতে হয়, সবদিক দেখাশুনা করতে হয়। আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আমি শুনেছি, বন্দী অনেক মেয়ে এসেছে। যদি একটি মেয়ে আমাকে দেন, খুব উপকার হয় আমার।'

মহানবী (সা) কম্পিত কণ্ঠে বললেন, 'প্রিয় কন্যা আমার, যে সম্পদ এবং বন্দীদের তুমি দেখছ সবই মুসলিম জনসাধারণের। আমি এ সবের খাজাঞ্চি মাত্র। আমার কাজ হলো এগুলো সংরক্ষণ করা এবং যথার্থ প্রাপকদের তা দিয়ে দেয়া। তুমি সেই প্রাপকদের একজন নও। সুতরাং এখান থেকে আমি তোমাকে কিছুই দিতে পারি না। প্রিয় কন্যা, এই দুনিয়া কঠোর সংগ্রামের ক্ষেত্র। তুমি তোমার কাজ করে যাও। যখন ক্লান্ত হবে, আল্লাহকে স্মরণ করবে এবং তাঁর সাহায্য চাইবে। তিনিই তোমাকে শক্তি যোগাবেন।'

'আল্লাহ' শব্দে দাসুর–এর হাত থেকে তরবারি পড়ে গেল

মহানবী (সা) একদিন একটি গাছের তলায় ঘুমিয়েছিলেন। এই সুযোগে দাসুর নামে একজন শত্রু তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল। শোরগোল করে সে মহানবী (সা)–কে ঘুম থেকে জাগাল।

মহানবীর (সা) ঘুম ভাঙলে চোখ খুলে দেখলেন, একটা উন্মুক্ত তরবারি তাঁর উপর উদ্যত।

ভয়ানক শত্রু দাসুর চিৎকার করে উঠল, 'এখন আপনাকে কে রক্ষা করবে?'

মহানবী (সা) ধীর শান্ত কণ্ঠে বললেন, 'আল্লাহ!'

শত্রু দাসুর মহানবীর (সা) এই শান্ত গম্ভীর কণ্ঠের 'আল্লাহ' শব্দে কেঁপে উঠল। তার কম্পমান হাত থেকে খসে পড়ল তরবারি।

মহানবী (সা) তার তরবারি তুলে নিয়ে বললেন, 'এখন তোমাকে কে রক্ষা করবে, দাসুর?' সে উত্তর দিল, 'কেউ নেই রক্ষা করার।'

মহানবী (সা) বললেন, 'না, তোমাকেও আল্লাহই রক্ষা করবেন।' এই বলে মহানবী (সা) তাকে তার তরবারি ফেরত দিলেন এবং চলে যেতে বললেন।

বিস্মিত দাসুর তরবারি হাতে চলে যেতে গিয়েও পারল না। ফিরে এসে মহানবীর হাতে হাত রেখে পাঠ করল ঃ 'লা–ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।'

একদিন কয়েকজন সাহাবী নবী করীম (সা)-এর নিকট বসা ছিলেন, ঐ সময় একজন লোক তাঁদের সামনে দিয়ে চলে গেল। নবী করীম (সা) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, ঐ লোকটি সম্বন্ধে তোমরা কি জান?

তাঁরা বললেন, তিনি শরীফযাদা, ভাল ঘরে বিয়ে করতে চাইলে সবাই সাদরে গ্রহণ করবে। কথা বলতে থাকলে সবাই মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনবে এবং কারো জন্য সুফারিশ করলে কথা রাখবে।

তাঁদের কথা শুনে নবী করীম (সা) চুপ করে রইলেন।

একটু পরে আরেক ব্যক্তি সেখান দিয়ে চলে গেল। নবী করীম (সা) সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি সম্বন্ধে তোমাদের অভিমত কি?

তাঁরা বললেন, সে একজন ভিক্ষুক, তাকে কেউ ভিক্ষে দেয় না, তার কথাও কেউ শোনে না, কারও জন্য সুফারিশ করতে গেলে তার কথা কেউ আমল দেয় না।

শুনে নবী করীম (সা) বললেন, প্রথম লোকটির মত যদি দুনিয়ার সব লোক হয়ে যায়, তথাপি সকলে মিলে দ্বিতীয় লোকটির সমান হবে না।

নিতান্ত দরিদ্র ও তুচ্ছ ব্যক্তিও যদি সৎ পথে বিচরণ করে, সৎকার্য করে জীবন কাটায়, তবে আল্লাহর নিকট সে বেআমল শরীফ লোক থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ এবং সম্মানিত।

মহানবীর (সা) মৃত্যুর পর আবুবকর সিদ্দীক (রা) খলীফা নির্বাচিত হলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মহানবী (সা) সিরিয়ায় একটি অভিযান প্রেরণের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর ঘটনায় সেই মুহূর্তে তা স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু আবুবকর (রা) খলীফা হয়েই সেই অভিযান প্রেরণের উদ্যোগ নিলেন। মুসলিম নেতৃবৃন্দের অনেকেই এর সাথে দ্বিমত পোষণ করলেন এই বলে যে, মদীনা অরক্ষিত হয়ে পড়লে মহানবীর (সা) মৃত্যুর সুযোগ নিয়ে গোলযোগকারী যারা মাথা তুলতে চাচ্ছে, তারা সুযোগ পেয়ে যেতে পারে।

জবাবে খলীফা আবুবকর (রা) বললেন, "মহানবীর (সা) কোন সিদ্ধান্তকে আমি অমান্য করতে পারবো না। মদীনা হিংস্র বন্য জন্তুর শিকারে পরিণত হয় হোক, কিন্তু সেনাবাহিনীকে তাদের মৃত মহান নেতার ইচ্ছা পূরণ করতেই হবে।"

হযরত আবুবকর (রা) এর প্রেরিত এই অভিযান ছিল সিরিয়া, পারস্য ও উত্তর আফ্রিকায় ইসলামের বিজয় অভিযানের মিছিলে প্রথম গৌরবোজ্জ্বল অভিযাত্রা।

অভিযান সফল হয়েছিল। দেড়মাস পর সেনাপতি উসামা বিজয়ীর বেশে মদীনায় ফিরে এসেছিলেন।

মহানবী (সা) কবি আব্বাসের জিহবা কাটার হুকুম দিলেন

হুনাইনের যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হবার মুখেও আল্লাহর মেহেরবানীতে বিজয় লাভ করল। প্রচুর গনীমতের মাল পাওয়া গেল যুদ্ধ থেকে। নিয়ম অনুযায়ী তিনি চার–পঞ্চমাংশ মুজাহিদদের মধ্যে বিতরণ করে দিলেন। অবশিষ্ট এক–পঞ্চমাংশ প্রয়োজন অনুসারে বিতরণ করলেন।

আব্বাস নামে একজন দুর্বল চরিত্রের নও মুসলিম কবিও তার অংশ মহানবী (সা)–এর কাছ থেকে পেলেন। কিন্তু তাঁর অংশে তিনি সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তিনি একটি কবিতার মাধ্যমে তাঁর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেন যাতে মহানবী (সা) সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য ছিল। মহানবী (সা) তা শুনে হাসলেন এবং বললেন, "ওকে নিয়ে যাও এবং জিহবা কেটে দাও।"

আলী (রা) ভয়ে কম্পমান কবিকে মাঠে নিয়ে গেলেন যেখানে বিজিত ভেড়া ছাগল ছিল। আলী (রা) কবিকে বললেন, "ভেড়া ছাগলের পাল থেকে যত ইচ্ছা নাও।"

কবি আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন, "মহানবী (সা) কি এভাবেই আমার জিহবা কাটতে বলেছেন? আমি আল্লাহর নামে শপথ করছি, আমি কিছুই নেব না।" এরপর কবি আব্বাস মহানবী (সা)–এর প্রশস্তিমূলক ছাড়া কোন কবিতাই আর লিখেননি।

রাসূলুল্লাহ (সা) কদাচিৎ দু'বেলা পেটভরে আহার করতে পেরেছেন

রাসূলুল্লাহর (সা) ইন্তিকালের পর একদিন এক ভিখারিণী তার দুই সন্তানসহ হযরত আয়িশার (রা) নিকট এসে কিছু খাবার প্রার্থনা করলো। এ সময় হযরত আয়িশার (রা) নিকট মাত্র তিনটি খেজুর ছিল। তিনি এই ভিখারিণী এবং দুই সন্তানকে তিনটি খেজুর প্রদান করেন। মহিলা দু'টি খেজুর তার দুই সন্তানকে দিল এবং নিজের জন্য অপরটি রেখে দিল। শিশুদ্বয় দু'টি খেজুর খাওয়ার পর তাদের মায়ের দিকে তাকালো। মা তাদের চাহনির অর্থ বুঝতে পারলো। নিজের জন্য রাখা অপর খেজুরটি অতঃপর দু'ভাগ করে দুই সন্তানকে দিল। নিজের জন্য কিছুই রইলো না। মাতৃস্নেহের এই দৃশ্য আয়িশা সিদ্দীকার (রা) হৃদয় স্পর্শ করলো। তিনি কেঁদে ফেললেন।

একদিন আয়িশা সিদ্দীকা (রা) খেতে বসে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) অবশ্য জীবিত নেই। তিনি বললেন, 'আমি যখন ভরা পেটে খাই, তখন অশ্রু সংবরণ করতে পারি না।' পার্শ্বে দন্ডায়মান এক মহিলা এর কারণ কি জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে আয়িশা (রা) বললেন, 'রাসূলুল্লাহর (সা) কথা আমার মনে পড়ে। রাসূলুল্লাহ (সা) জীবিতাবস্থায় কদাচিৎ দু'বেলা পেট ভরে আহার করতে পেরেছেন।'

হযরত আবু বকরের অন্তিম ওসিয়ত ও উপদেশ

ইসলামের প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রা) এর জীবনের অন্তিম ও প্রধান কাজ হলো পরবর্তি খলীফা হিসেবে হযরত উমারকে নিযুক্তি দান। আহলে রায় অনেকের সাথে তিনি এ ব্যাপারে পরামর্শ করেন এবং অবশেষে হযরত উসমান (রা)কে ডেকে এ সম্পর্কে ওসিয়ত ও উপদেশ লিপিবদ্ধ করেন। সেই ঐতিহাসিক দলিলটি এই ঃ–

"পরম দয়ালু ও মেহেরবান আল্লাহর নামে, আল্লাহর দাস এবং মুসলমানদের নেতা আবু কুহাফার পুত্র আবুবকর তাঁর ইন্তিকালের মুহূর্তে তাঁর পরবর্তী খলীফা ও মুসলমানদের উদ্দেশ্যে এই ওসিয়তনামা লিপিবদ্ধ করছেন এবং স্মরণ করাচ্ছেন যে, মৃত্যুকাল এমনই এক কঠিন সময় যে সময়ের কষ্ট ও ভয়াবহতায় অভিভূত হয়ে কাফিরও মুমিন হতে চায়, চরিত্রহীন ব্যক্তি চরিত্রবান হতে চায় এবং মিথ্যাচারী সত্যের আশ্রয় গ্রহণের জন্যে হয়ে ওঠে ব্যাকুল।

"মুসলমানগণ! আমি আমার পরে খাত্তাবের পুত্র উমারকে তোমাদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করছি। তিনি যতদিন কুরআন ও রাসূলের নীতি অনুযায়ী চলবেন ও তোমাদের সেই আদর্শানুযায়ী পরিচালিত করবেন, তোমরা দ্বিধাশূন্য চিত্তে তাঁর আনুগত্য করবে। আল্লাহ ও রাসূল এবং তাঁদের মনঃপূত ইসলাম ও মুসলমান এবং মানবজাতি সম্বন্ধে আমার উপর যে গুরুদায়িত্ব অর্পিত ছিল, তা আমি উপযুক্ত ব্যক্তির ওপর ন্যস্ত করে কর্তব্য সম্পাদনের চেষ্টা করেছি। আমার বিশ্বাস, উমার নিরপেক্ষভাবে শাসনদন্ড পরিচালনা করে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি করবেন। কিন্তু এর ব্যতিক্রমের দায়িত্ব তাঁর নিজের, কারণ আমি তাঁর বর্তমান ও অতীত জীবনের পরিচয়ের উপর নির্ভর করে তাঁকে আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি, কিন্তু ভবিষ্যতের দায়িত্ব আমার নয়। কারণ আমি অন্তর্যামী নই।

তবে এ কথা তাঁকে আমি অবশ্যই স্মরণ করাচ্ছি যে, যদি তিনি নিজের রূপ ও আচরণের পরিবর্তন করেন যা ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য ক্ষতিকর ও গ্লানিকর হতে পারে, তবে তার বিষময় ফল অবশ্যই তাঁকে ভোগ করতে হবে। তোমাদের সকলেরই কল্যাণ হোক।"

ওসিয়তনামা লেখা শেষ হলে তা সীলমোহর করে হযরত উমারকে ডেকে হযরত আবু বকর (রা) তাকে এই উপদেশ দিলেন ঃ

"খাত্তাবের পুত্র উমার! আমি তোমাকে যাঁদের জন্য খলীফা মনোনীত করছি তাঁদের মধ্যে আল্লাহর প্রিয় নবীর সাহাবাবৃন্দও রয়েছেন। আশা করি এর গুরুত্ব তুমি সম্যক উপলব্ধি করবে। এই গুরুদায়িত্ব পালনে আমি তোমাকে আল্লাহভীতি সম্বল করতে উপদেশ দিচ্ছি। কারণ যাঁর অন্তর সর্বদা আল্লাহর নিকট জওয়াবদিহির দায়িত্ব স্মরণ করে ভীত, সে ব্যক্তি কখনই অন্যায় কাজে লিপ্ত হতে পারে না। মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ভাগ্যবান যিনি লোভমুক্ত হয়েছেন এবং স্বীয় কর্তব্য নির্ধারণপূর্বক যথা সময়ে তা পালন করতে তৎপর হয়েছেন। সুতরাং তুমি কখনই দিনের করণীয় রাতের জন্য অথবা রাতের করণীয় দিনের জন্য ফেলে রাখবে না এবং কাজের গুরুত্ব ও লঘুত্ব উপলব্ধি করে সর্বাগ্রে গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলী সমাধা করবে। মনে রেখো, যে ব্যক্তি ফরয কাজ ফেলে রেখে নফলকে গুরুত্বদান করে, তার কাজ ততক্ষণ আল্লাহ কর্তৃক গৃহীত হয় না, যতক্ষণ সে ফরযের গুরুত্ব বুঝে তা সম্পাদন না করে। সকল মানুষকে সমান দৃষ্টিতে দেখা এবং শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে নিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাতেই ইসলামের মহিমা ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আরো জেনে রাখো, যে ব্যক্তি সত্য ও ন্যায় বিচারকে প্রাণাপেক্ষাও ভালবেসে ইহলোকে কর্তব্য সম্পাদন করেছে, কিয়ামতের দিন তারই পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে। কিন্তু যারা ইহলোকে মিথ্যার তাঁবেদারী করে অন্যায়, অত্যাচার ও অনাচারে লিপ্ত হয়েছে, পরলোকে তাদের পুণ্যের পাল্লা শোচনীয়ভাবে হালকা হয়ে পড়বে।

"হে উমার! আল্লাহ কি কারণে কুরআনে এক সঙ্গে অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এবং পুরস্কার ও শাস্তির নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, তার মর্ম উপলব্ধির চেষ্টা করবে। এর মর্ম হচ্ছে এই যে, মুমিনরা আশা ও নিরাশার মধ্যে থেকে কর্তব্য নির্ধারণ করতে সমর্থ হবে। সুতরাং তুমি এরূপ কোন অন্যায় লোভ এবং আশায় কখনই অভিভূত হবে না, যে আশা তোমাকে লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্তুর আকাঙ্খা কখনই করবে না। আবার নিজের জন্য যা অপরিহার্য তা কখনই বিনা কারণে ত্যাগ করবে না।

"হে উমার! আল্লাহ সেই সব অসৎ লোকদের জন্য জাহান্নামের ব্যবস্থা করেছেন, যাদের দুষ্কর্ম এতদূর সীমা লংঘন করেছে যে, আল্লাহ তাদের সৎকর্মসমূহ দূরে নিক্ষেপ করেছেন। অতএব তুমি যখন দোজখবাসীদের সম্পর্কে আলোচনা করবে, তখন নিজের সম্বন্ধে এটুকুই বলবে যে, 'আশা করি আল্লাহর অনুগ্রহে আমি তাদের (জাহান্নাম বাসীদের) দলভুক্ত হব না।' আল্লাহ সৎকর্মশীলদের জন্যই অনন্ত সুখের নিলয় জান্নাতের ব্যবস্থা করেছেন। অতএব

তুমি যখন পুণ্যাত্মা জান্নাতবাসীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করবে, তখন নিজের সম্বন্ধে এই ভাব প্রকাশ করবে যে, হে আল্লাহ, তুমি আমার অন্তরে এরূপ সৎকর্মের প্রেরণা দান কর, যার দ্বারা আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারি।

"হে উমার, যদি তুমি আমার এই উপদেশগুলি কার্যকর করতে চাও, তবে যে মৃত্যু প্রত্যেক জীবের জন্য এবং তোমার জন্যও অবধারিত রয়েছে, তাকেই সর্বাপেক্ষা প্রিয়জ্ঞানে সব সময় স্মরণে রাখবে। মনে রেখো, খোদাপ্রেমিক পুণ্যাত্মা ব্যক্তিরাই মৃত্যুকে আলিঙ্গন করার জন্যে ব্যাকুলিত ভাবে জীবন যাপন করেন, আর অসৎকর্মশীল ব্যক্তিরাই সর্বদা মৃত্যুভয়ে সন্ত্রস্ত থাকে। কিন্তু অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে কারুরই রেহাই নেই।"

উপদেশ শ্রবণের পর উমার (রা) বিদায় নিলে আবুবকর (রা) রোগজীর্ণ দুর্বল দু'টি হাত উর্ধ্বে উত্তোলন করে আল্লাহর দরবারে মুনাজাত করলেন ঃ

"হে দয়াময় অন্তর্যামী আল্লাহ, তোমার কাছে কিছুই গোপন থাকার কথা নয়। সুতরাং আমি কোন্ প্রেরণায় চালিত হয়ে উমারকে মুসলমানদের খলীফা মনোনীত করেছি, সেসবই তুমি অবগত আছ। আমার পরে মুসলমানরা যাতে কোন প্রকার অন্তর্বিপ্লবে ধ্বংস হয়ে না যায়, সেজন্য অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সবচেয়ে সত্যানুরাগী ও চরিত্রনিষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা ধর্মপরায়ণ, সর্বাপেক্ষা কর্তব্যনিষ্ঠ, সবচেয়ে ন্যায়পরায়ণ ও শক্তিবান এবং মুসলমানদের সর্বাপেক্ষা হিতাকাঙ্খী উমারকে তাঁদের জন্য খলীফা নিযুক্ত করেছি। হে আল্লাহ, তোমার সমন আমার কাছে পৌছে গিয়েছে এবং ইহলোক হতে বিদায় গ্রহণের পূর্বে যথাসম্ভব সতর্কতার সাথে নিজের দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করে মুসলমানগণ ও তাদের নেতা উমারকে এবং তাদের ভবিষ্যতকে ও মখলুককে তোমারই কাছে সমর্পণ করছি। তুমি উমারকে এমনভাবে পরিচালিত করো যেন সে আদর্শ ও লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত না হয়ে মুসলমানের ও মখলূকের (সৃষ্টির) কল্যাণ সাধনে সমর্থ হয় এবং তাঁকে তুমি মুসলমানদের নিকট অতি প্রিয় করে তুলো। পক্ষান্তরে উমার যাতে তোমার আনুগত্য ও সৃষ্টির প্রতি তোমার মূর্ত অনুগ্রহস্বরূপ শেষ নবীর সুন্নাত (নীতি) এবং তাঁর অন্তে প্রত্যেক ন্যায়াচারী সৎকর্মশীল মুত্তাকী লোকের নীতি-পালন করে তোমার প্রীতিভাজন খুলাফায়ে রাশেদীনের অন্তর্ভূক্ত হতে পারে, সেই ব্যবস্থা করো এবং তার প্রজাসাধারণ সৎ ও সাধুস্বভাব লাভ করে যাতে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে জীবন-যাপন করতে পারে সেই ব্যবস্থা করো- আমি এই প্রার্থনা জানাচ্ছি।"

প্রাদেশিক গভর্ণরদের প্রতি খলীফা উমার বলেন :

"হে লোকেরা! আল্লাহর নাফরমানীর কাজে আনুগত্যের দাবী করার অধিকার কারো নেই। এমন ব্যক্তির আনুগত্য করা কিছুতেই বৈধ নয়, যে আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজের নির্দেশ দেয়।· একজনকে অপর জনের উপর যুল্‌ম করার কোন সুযোগ আমি দেবো না। কেউ যদি এমনটি করে তবে তার মুখমন্ডল পদাঘাতে ধূলোমলিন করে ছাড়বো। যাতে করে সে সঠিক পথ অবলম্বনে বাধ্য হয়।···· ভালো করে শুনে নাও, অমি তোমাদের যালেম ও জাববার বানিয়ে পাঠাইনি। তোমাদের পাঠিয়েছি জনগণের হেদায়েত লাভের পথপ্রদর্শক হিসেবে। জনগণ যাতে তোমাদের দ্বারা সঠিক পথের সন্ধান লাভ করে। তোমরা মহানুভবতার সাথে জনগণের হক আদায় করবে। তাদের উপর অত্যাচার করবে না। তাদের প্রশংসায়ও মুখরিত হবে না, যাতে তোমাদের সাথে তাদের বিশেষ সম্পর্ক গড়ে উঠে। তোমাদের দুয়ার তাদের জন্য বন্ধ রাখবে না ···· যার ফলে শক্তিমানেরা দুর্বলদের উপর প্রভাব বিস্তারে সুযোগ পায়। নিজেকে তাদের উপর অগ্রাধিকার দিয়ে তাদের প্রতি যুল্‌ম করো না। অজ্ঞতা ও কঠোরতার আচরণ তাদের সাথে করবে না। তাদের দ্বারা কাফিরদের সঙ্গে লড়াই করবে কিন্তু সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা তাদের উপর চাপাবে না, যা তাদের ক্লান্তিতে অবশ করে দেবে।···· হে মুসলামানগণ, তোমরা সাক্ষী থাকো, আমি গভর্ণরদের শুধু এ জন্যে পাঠাচ্ছি, যেনো তারা শিক্ষা দেয়, গনীমতের মাল বন্টন করে, ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করে, জনগণের মুকাদ্দামার ফায়সালা করে এবং কোনো সমস্যা দেখা দিলে তা যেনো আমার সামনে উপস্থাপন করে।"

"এমন এক সময় ছিল আমার জীবনে, যখন আমি খালাম্মার ছাগল চরাতাম। পরিবর্তে তিনি আমাকে দিতেন মুষ্টিতে করে খেজুর। আর আজ সেই আমি এই অবস্থায় উপনীত হয়েছি।" একদিন মসজিদের মিম্বরে উঠে হযরত উমার (রা) শুধু একথা কয়টি বলেই নেমে পড়লেন।

ঐ কথাগুলো এবং এই ধরনের অস্বাভাবিক আচরণ দেখে সবাই অবাক হলেন। আবদুর রহমান ইবন আউফ বলেই ফেললেন, "আমীরুল মুমিনীন, এর দ্বারা তো আপনি লোকদের সামনে নিজেকে ছোট করলেন।"

হযরত উমার (রা) বললেন, "ঘটনা হলো, একাকীত্বের সময় আমার মনে একথা জেগেছিল যে, তুমি আমীরুল মুমিনীন, তোমার চেয়ে বড় কে হতে পারে। তাই আমি প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করে দিলাম যেন ভবিষ্যতে এমন কথা মনে আর না জাগে।"

মদীনার এক পল্লী। তখন রাত।

খলীফা উমার (রা) নাগরিকদের অবস্থা জানার জন্যে মদীনার রাস্তায় ঘুরছিলেন। হঠাৎ এক বাড়ীতে এক বৃদ্ধা ও তাঁর কন্যার কথোপকথন শুনে দাঁড়ালেন। কান পাতলেন তিনি। বৃদ্ধা মেয়েকে বলছেন, "মা, দুধে পানি মিশিয়ে বিক্রি করলে হয় না? তাহলে আমাদের অবস্থা আরও সচ্ছল হয়।"

কন্যা তার উত্তরে বলল, "তা কি করে হয়, মা। খলীফার হুকুম, কেউ দুধে পানি মেশাতে পারবে না।"

বৃদ্ধা বলল, "হোক না খলীফার আদেশ, কেউ তো আর দেখছে না।"

কন্যা প্রতিবাদ করে বলল, "না মা তা হয় না। প্রত্যেক বিশ্বাসী মুসলমানের কর্তব্য খলীফার আদেশ মেনে চলা। খলীফা না দেখতে পান কিন্তু আল্লাহ তো সর্বব্যাপী, তার চোখে ধুলো দেব কি করে?"

খলীফা উমার দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব কথা শুনলেন। খলীফা উমার (রা) বাড়ীতে ফিরে এলেন।

তিনি ঘটনাটা ভুলতে পারলেন না। ভাবলেন, অজানা ঐ মেয়েটিকে কি পুরস্কার দেয়া যায়। অনেক ভেবে একটা সিদ্ধান্ত নিলেন।

পরদিন দরবারে এসে খলীফা সেই অজানা মেয়েটিকে ডাকলেন। আহূত হয়ে মা ও মেয়ে ভীতত্রস্ত কম্পিত পদে খলীফার দরবারে এসে উপস্থিত হলো।

তারা উপস্থিত হলে খলীফা তাঁর পুত্রদের ডাকলেন। পুত্রদের নিকট গত রাতের সমস্ত বিবরণ দিয়ে তিনি তাদের আহবান করে বললেন, "কে রাযী হবে এই কন্যাকে গ্রহণ করতে? এর চেয়ে উপযুক্ত কন্যা আর আমি খুঁজে পাইনি।"

পুত্রদের একজন তৎক্ষণাৎ রাযী হলো। কন্যাও সম্মতি দিল। খলীফার ছেলের সাথে বিয়ে হয়ে গেল মেয়েটির।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের দামেস্ক নগরী।

সম্রাটের সেনাপতি ক্লিভাস অগণ্য সৈন্য নিয়ে অবস্থান করছেন দুর্ভেদ্য দুর্গ-নগরী দামেস্কে।

সেনাপতি ক্লিভাস সৈন্য সংখ্যার অহংকারে অন্ধ।

জানবাজ মুসলিম বাহিনী নিয়ে সেনাপতি খালিদ অবরোধ করেছেন দামেস্ক নগরী।

প্রথা অনুসারে সেনাপতি খালিদ ইসলামের দাওয়াত নিয়ে গেলেন ক্লিভাসের দরবারে।

সম্রাট হিরাক্লিয়াসের শক্তিমদ-মত্ত সেনাপতি ক্লিভাস। তার দো-ভাষী জারজিস-এর মাধ্যমে সে বিশ্ব ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বীর সেনাপতি খালিদ বিন ওয়ালিদকে নানা ভয়-ভীতি দেখাতে লাগল।

খালিদ এসেছেন দামেস্ক জয় করতে। দো-ভাষীর সব কথা শুনে বীরশ্রেষ্ঠ খালিদ বললেন, 'আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলছি, তোমাদেরকে আমরা সেইসব ক্ষুদ্র পাখির ঝাঁকের মতো মনে করি, শিকারীরা যাদের জাল পেতে ধরে খায়। শিকারী কোন দিনই পাখির সংখ্যাধিক্যে ঘাবড়ায় না বরং তাতে শিকারী আরো খুশী হয়। চতুর্দিকে জালের বেড়া দিয়ে সে অনায়াসেই ধরে ফেলে। হে জারজিস, তুমি জেনে রাখ, আমার সৈন্যগণ আল্লাহর পথে জিহাদে নেমেছে। তারা মৃত্যুকে মনে করে নিয়ামত। সেই নিয়ামতের জন্য তারা কতো ব্যাকুল তা স্বচক্ষে দেখতে পাবে। তারা এমন মৃত্যুর মাঝেই অমর জীবনের সাক্ষাৎ পায়। শহীদ হওয়ার সিদ্ধান্ত যাদের, তাদের কাছে বেঁচে থাকা একটা আযাব। যাও তুমি তোমার সম্রাটকে এ কথা বলে দাও।'

দূত উটের পিঠে, খলীফা পায়ে হেঁটে. . . .

৬৩৫ খৃষ্টাব্দ। তখন কাদেসিয়ায় যুদ্ধ চলছিল। খলীফা উমার (রা) উদ্বিগ্ন ছিলেন ফলাফল জানার জন্যে। সেদিন মদীনার বাইরে তিনি পায়চারি করছিলেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন দূতের প্রতীক্ষায়।

এমন সময় তিনি দেখলেন অনেক দূরে ধূলি উড়িয়ে একজন ঘোড়সওয়ার ছুটে আসছেন মদীনার দিকে। ঘোড়সওয়ার কাছে আসতেই খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পারলেন কাদেসিয়া থেকে সেনাপতি সা'দ তাকে পাঠিয়েছেন। খলীফার কাছে যুদ্ধের বিজয়বার্তা তিনি বয়ে এনেছেন।

দূত সাধারণ পোশাক পরিহিত খলীফাকে চিনল না। খলীফা তাঁর উটের পাশ ঘেঁষে হেঁটে হেঁটে মদীনার দিকে চললেন। দূত উটের পিঠে আর খলীফা উটের পাশে পায়ে হেঁটে। সামান্য অহমিকাও খলীফার মধ্যে নেই।

উমার (রা) প্রাসাদ প্রত্যাখ্যান করলেন

অর্ধেক জাহানের পরাক্রমশালী শাসক উমার (রা) গেছেন জেরুসালেমে।

পরাজিত রোমান গভর্ণর তাঁর হাতে তুলে দিয়েছেন রোমান নগরী। এর আগেই জেরুসালেম নগরীর পতন ঘটে, মুসলিম বাহিনীর হাতে।

রোমান গভর্ণর মহা আড়ম্বরে স্বাগত জানিয়ে উমার (রা)কে নিয়ে গেলেন নগরীর ভেতরে।

রোমান গভর্ণর সুন্দর সুসজ্জিত বিলাসবহুল প্রাসাদে খলীফার থাকার ব্যবস্থা করলেন। হযরত উমার (রা) সবিনয়ে এই ব্যবস্থা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "আমার ভাইদের সাথে সাধারণ তাঁবুতে থাকাই আমার জন্য বেশী আরামদায়ক হবে।"

ইসলামের শাসক ও নেতারা এমনিই ছিলেন। তাঁরা ছিলেন সাধারণের সাথে একাত্ম। আলাদা প্রাসাদ নয়, সাধারণের সাথেই তাঁরা বাস করতেন।

মহানবীর (সা) দৌহিত্রী কাপড় পেলেন না

উমার (রা) কে মহানবী (সা) উপাধি দিয়েছিলেন 'আল–ফারুক'।

সত্যিই তিনি ছিলেন 'আল–ফারুক'– সত্য ও মিথ্যার সুস্পষ্ট প্রভেদকারী।

বিচারের ক্ষেত্রে, সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রীতি বা অন্যকোন বিবেচনায় সামান্য পক্ষপাতিত্ব তিনি যেমন করতেন না, তেমনি কারও তিলমাত্র অধিকারকেও তিনি উপেক্ষা করতেন না।

একদা হযরত উমার (রা) কর্তৃক মদীনায় মহিলাদের মধ্যে কিছু কাপড় বন্টন শেষে একখানা উত্তম চাদর অবশিষ্ট রয়ে গেল।

তখন তাঁর কাছে উপস্থিত কেউ তাঁকে বললেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন, আপনার কাছে আল্লাহর রাসূলের যে দৌহিত্রী রয়েছেন এ চাদরখানা তাকে দিয়ে দিন।'

দৌহিত্রী বলতে এখানে আলী (রা)–এর কন্যা উম্মে কুলসুমকে বুঝাচ্ছিলেন।

উমার (রা) জবাব দিলেন, 'উম্মে সুলাইমই তা পাওয়ার অধিক উপযুক্ত। অধিক উপযুক্ত হবার কারণ হচ্ছে, সে উহুদ যুদ্ধের দিনে আমাদের জন্য তরবারির খাপ তৈরি করত।'

মুসলমানরা আদর্শ জাতি।

নীতি–নিষ্ঠতা এই জাতির প্রাণ।

ওয়াদা পালন ও শপথ রক্ষা মুসলমানদের অনড় একটা নীতি।

এমনকি কোন চুক্তি বা ওয়াদা পরোক্ষ বা প্রকৃত দায়িত্বশীলের পক্ষ থেকে না হলেও তাকে মুসলমানরা সম্মান দেখায়।

খলীফা উমার (রা) এর শাসনকালের একটি ঘটনা।

মুসলিম বাহিনী পারস্যের শুহরিয়াজ নামক একটি শহর অবরোধ করে। নগরটির পতন নিশ্চিত হয়ে ওঠে। ঠিক সেই সময় মুসলিম বাহিনীর একজন গোলাম শহরবাসীর নামে নিরাপত্তা সনদ লিখে তীরের সাথে বেঁধে শহরে ছুঁড়ে দেয়।

পরদিন যখন মুসলিম বাহিনী আক্রমণ চালায়, তখন শহরবাসী দরজা খুলে বেরিয়ে পড়ে এবং বলে, 'একজন মুসলিম আমাদের নিরাপত্তা দিয়েছে, এখন তোমরা কি জন্য যুদ্ধ করছ?'

নিরাপত্তা সনদটি পড়ে দেখা গেল একজন গোলামের লিখা।

এ সম্পর্কে খলীফা উমারের (রা) মতামত চেয়ে তাঁকে জানানো হলো যে, 'নিরাপত্তা সনদটি গ্রহণযোগ্য কিনা?'

জবাবে খলীফা লিখলেন, 'সনদটি নিরাপত্তার বৈধ দলিল, শহরবাসীকে নিরাপত্তা দিতে হবে।'

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)।

তাঁকে জ্ঞানের দরওয়াজা বলা হতো।

সরলতার তিনি ছিলেন মূর্ত প্রতীক।

খলীফা হওয়ার পরও সাধারণ মানুষ এবং তাঁর মধ্যে কোন পার্থক্যই তিনি বরদাশত করতেন না।

একদিনের ঘটনা। খলীফা আলী (রা) প্রায়ই জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে দেখার জন্য বাজারে যেতেন। একদিন তিনি বাজারে যাচ্ছেন। পথিমধ্যে এক ব্যক্তি তাঁকে দেখেই তাঁর সম্মানার্থে থেমে যায় এবং তাঁর পিছু পিছু চলতে থাকে।

খলীফা বললেন।' "আমার পাশাপাশি চলো।" "আমীরুল মুমিনীন! আপনার মর্যাদা ও সম্মানার্থে পিছে হাঁটছি"– লোকটি বলল।

খলীফা বললেন, "সম্মান ও মর্যাদা প্রদানের এ পন্থা ঠিক নয়। এতে শাসকদের জন্যে ফিতনা ও মুমিনদের জন্য অপমান রয়েছে।" বলে তিনি তাকে পাশাপাশি চলতে বাধ্য করলেন।

আলীর (রা) কাছে একটি প্রশ্ন দশটি উত্তর

একদা ১০ জন লোক হযরত আলীর (রা) নিকট হাযির হলো এবং বলল, 'আমরা আপনাকে একটা প্রশ্ন করার অনুমতি চাচ্ছি।' হযরত আলী (রা) বললেন, 'স্বাধীনভাবে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন।'

তারা প্রশ্ন করল, "জ্ঞান ও সম্পদের মধ্যে কোনটা ভাল এবং কেন ভাল? অনুগ্রহ করে আমাদের প্রত্যেকের জন্যে একটি করে জবাব দিন।"

জবাবে হযরত আলী (রা) নিম্নলিখিত ১০টি উত্তর দিলেন ঃ

(১) জ্ঞান হলো মহানবীর (সা) নীতি, আর সম্পদ ফেরাউনের উত্তরাধিকার। সুতরাং জ্ঞান সম্পদের চেয়ে উত্তম।

(২) তোমাকে সম্পদ পাহারা দিতে হয়, কিন্তু জ্ঞান তোমাকে পাহারা দেয়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

(৩) একজন সম্পদশালীর যেখানে শত্রু থাকে অনেক, সেখানে একজন জ্ঞানীর অনেক বন্ধু থাকে। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(৪) জ্ঞান উত্তম, কারণ এটা বিতরণে বেড়ে যায়, অথচ সম্পদ বিতরণে কমে যায়।

(৫) জ্ঞান উত্তম, কারণ একজন জ্ঞানী লোক দানশীল হয়, অন্যদিকে সম্পদশালী ব্যক্তি হয় কৃপণ।

(৬) জ্ঞান চুরি করা যায় না, কিন্তু সম্পদ চুরি হতে পারে। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(৭) সময় জ্ঞানের কোন ক্ষতি করে না, কিন্তু সম্পদ সময়ের পরিবর্তনে ক্ষয় পেয়ে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

(৮) জ্ঞান সীমাহীন, কিন্তু সম্পদ সীমাবদ্ধ এবং গোণা যায়। অতএব জ্ঞান উত্তম।

(৯) জ্ঞান হৃদয়-মনকে জ্যোতির্ময় করে, কিন্তু সম্পদ একে মসিলিপ্ত করার মত। সুতরাং জ্ঞান উত্তম।

(১০) জ্ঞান উত্তম। কারণ জ্ঞান মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ করে যেমন আমাদের মহানবী (সা) আল্লাহকে বলেছেন ঃ "আমরা আপনার উপাসনা করি, আমরা আপনারই দাস।" অন্যদিকে সম্পদ ফেরাউন ও নমরুদকে বিপদগ্রস্ত করেছে। যারা দাবী করে যে তারাই ইলাহ।'

)

উমার বিন আবদুল আযীযের দায়িত্বানুভূতি

খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর তাঁর নিজের অবস্থা সম্পর্কে উমার বিন আবদুল আযীয বলেন,

"আমি আমার নিজের ব্যাপারে চিন্তা করছি। আমি তীব্রভাবে অনুভব করছি, গোটা উম্মাহর ছোট বড় প্রতিটি কাজের দায়িত্ব আমার উপর ন্যস্ত। আমি যখন নিঃস্ব, অসহায়, গরীব, দুঃখী, কয়েদী এবং এরূপ অন্যান্য লোকদের কথা চিন্তা করি, যারা গোটা সাম্রাজ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে- যাদের দায়িত্বশীল আমি, আমি ভাবি আল্লাহ তায়ালা এদের ব্যাপারে আমাকে জিজ্ঞাসা করবেন। রাসূলুল্লাহ (সা) এদের সম্পর্কে কঠিন হাশরের ময়দানে জানতে চাইবেন। তখন আমি কি জবাব দেবো? আল্লাহর সামনে এবং ময়দানে হাশরে শাফায়াতকারীর সামনে যদি কোন ওজর পেশ করতে না পারি, তবে আমার পরিণাম কি হবে, এই চিন্তায় আমার ঘুম আসে না। আমার হৃদয় কাঁপছে, অশ্রু বিগলিত হচ্ছে।"

খিলাফতের দায়িত্ব নেবার পর লোকেরা উমার বিন আবদুল আযীযকে মুবারকবাদ জানাতে এলো। তিনি বললেন, 'তোমরা কাকে মুবারকবাদ দিতে এসেছ, সেই ব্যক্তিকে- যে ধ্বংসের মুখে নিক্ষিপ্ত হয়েছে? সবচাইতে বিপজ্জনক অবস্থায় পৌঁছে গেছে?'

তাঁকে নতুন খলীফা হবার জন্যে রাজ কোষাগার থেকে বিশেষ খুশবু দেয়া হলো। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে বললেন, 'খুশবু গ্রহণ করার মত আনন্দের দিন আমার শেষ হয়েছে। ইসলামী শাসনের অন্তর্ভুক্ত সমগ্র এলাকায় যদি একটি প্রাণীও অনাহারে থাকে বা কোন একজনের উপরও যদি যুল্‌ম হয়, তাহলে সবার আগে মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ উমারকেই পাকড়াও করবেন।'

কবিরা দীর্ঘ প্রশস্তিমূলক কবিতা লিখে দরবারে লাইন দিলেন। কিন্তু তাঁরা নিরাশ হলেন। খলীফা প্রশংসা শুনতে চান না এবং নিজের প্রশংসা শোনার জন্যে জনগণের অর্থের একটি কপর্দকও ব্যয় করাকে তিনি আমানতের খেয়ানত মনে করেন।

তিনি নিজের সম্পত্তির যৎকিঞ্চিৎ রেখে বাইতুলমালে জমা দিয়ে দিলেন। কারণ জনগণের অধিকার অন্যায়ভাবে গ্রাস করে তাঁর পূর্বসূরীরা এ সম্পত্তি হস্তগত করেছিলেন বলে তাঁর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল।

নিজের স্ত্রীকেও তিনি আহবান করে বললেন, 'আমাকে চাও, না তোমার বাপের দেয়া অন্যায়ভাবে আহরিত তোমার সম্পদগুলো চাও? যদি আমাকে চাও তো এই মুহূর্তে তোমার বাপের দেয়া সোনাদানা সব সম্পত্তি বাইতুলমালে জমা করে দাও।'

খলীফা সুলাইমানের কন্যা সোনাদানার পরিবর্তে স্বামীকেই পছন্দ করলেন। খলীফা উমার বিন আবদুল আযীয রাজপরিবারের লোকদের ভাতাও বন্ধ করে দিলেন।

এইভাবে খলীফা হওয়ার আগে যিনি বিত্তশালী ছিলেন, জাঁক-জমকে ডুবে ছিলেন, তিনি ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা হবার পর সব বিত্ত ও জাঁক-জমক পরিত্যাগ করে দারিদ্র গ্রহণ করলেন, নেমে এলেন সাধারণ মানুষের কাতারে।

জননেতা হয়ে উমার বিন আবদুল আযীয জনতার কাতারে নেমে এলেন

খলীফা সুলাইমানের মৃত্যুর পর উমার বিন আবদুল আযীয ইসলামী বিশ্বের খলীফার দায়িত্ব নিয়ে দামেস্কের সিংহাসনে বসেন।

খলীফা হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত রাজকীয় প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁর জীবন কেটেছে। কিন্তু জনগণের নেতা হবার পর সব প্রাচুর্য তিনি ছুড়ে ফেললেন, নেমে এলেন জনগণের কাতারে।

তিনি খলীফা নির্বাচিত হবার পর খলীফার প্রাসাদের দিকে চলছেন। রাস্তার দু' ধারে কাতারে কাতারে দাঁড়ানো আছে সৈন্যের দল।

খলীফা জিজ্ঞাসা করলেন, 'এরা কারা?' উত্তর এলো, 'এরা আপনার দেহরক্ষী সৈন্য।'

খলীফা বললেন, 'প্রয়োজন মতো এদের বাইরে পাঠিয়ে দাও। আমার দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই। জনগণের ভালবাসাই আমার প্রতিরক্ষা।'

প্রধান সেনাপতি সশ্রদ্ধ সালাম জানিয়ে তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিলেন।

উমার বিন আবদুল আযীয প্রাসাদে ঢুকলেন। দেখলেন, সেখানে ৮'শ' দাস তাঁর অপেক্ষায় দন্ডায়মান। জিজ্ঞাসা করে জানলেন, এরা তাঁরই সেবার জন্যে। খলীফা প্রধানমন্ত্রীকে বললেন, 'এদের মুক্ত করে দিন। আমার সেবার জন্যে আমার স্ত্রীই যথেষ্ট।'

প্রধানমন্ত্রী তাঁর হুকুম তামিল করলেন।

খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীযের কান্না

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের শক্তিমান খলীফা উমার ইবনে আবদুল আযীয।

দামেস্কে তাঁর রাজধানী। রাজধানীতে থাকলেও তার অতন্দ্র চোখ রাজ্যের খুঁটি–নাটি সব বিষয়ের প্রতি।

কিন্তু সব কি তিনি জানতে পারেন? সব সমস্যার সমাধান কি তিনি দিতে পারেন?

অপারগতার ভয় সব সময় তাঁকে অস্থির করে রাখে।

একদিন খলীফা উমার বিন আবদুল আযীযের স্ত্রী নামাযের পর খলীফাকে অশ্রুসিক্ত অবস্থায় দেখতে পেয়ে ক্রন্দনের কারণ জানতে চাইলেন। খলীফা বললেন, 'ওহে ফাতিমা, আমি মুসলমান এবং অন্য ধর্মাবলম্বীদের খাদেম নিযুক্ত হয়েছি। যে কাঙ্গালগণ অনশনগ্রস্ত, যে পীড়িতগণ অসহায়, যে বস্ত্রহীনগণ দুর্দশাগ্রস্ত, যে উৎপীড়িতগণ নিষ্পেষিত, যে অচেনা–অজানাগণ কারারুদ্ধ এবং যে সকল সম্মানিত বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি তাদের নগণ্য উপার্জন দ্বারা কষ্টে–সৃষ্টে বৃহৎ পরিবারের ভরণ–পোষণ করেন, তাদের বিষয় এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও দূরবর্তী প্রদেশে অনুরূপ দুর্দশাগ্রস্ত মানবকুলের বিষয়াদি চিন্তা করছিলাম। শেষ বিচারের দিন মহাপ্রভু আমার কাছে হিসেব চাইবেন। সেই জবাবদিহিতে কোন আত্মরক্ষার কৌশলই কাজে লাগবে না। আমি তা স্মরণ করে কাঁদছিলাম।'

বিশাল ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা উমার বিন আবদুল আযীয। তাঁর সাম্রাজ্য তখন পূর্বে ভারত থেকে পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগর, দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা থেকে উত্তরে স্পেন ও চীন পর্যন্ত বিস্তৃত।

খলীফা উমার ইবন আবদুল আযীযের রাজধানী দামেস্ক তখন শক্তি ও সমৃদ্ধিতে দুনিয়ার সেরা।

সেই খলীফা উমার বিন আবদুল আযীযের জীবন ছিল দারিদ্রে ভরা। একদিনের ঘটনা।

সেদিন খলীফার স্ত্রী তাঁর চাকরকে খেতে দিলেন। আর দিলেন শুধু ডাল।

নতুন চাকর খাবার দেখে বিস্মিত হলো। বিস্ময়ভরা চোখে বললো, 'এই আপনাদেরখাদ্য।'

খলীফা পত্নী উত্তরে বললেন, 'এই সাধারণ খাদ্যই খলীফা দিনের পর দিন গ্রহণ করে যাচ্ছেন।'

ইসলামে রাষ্ট্রের সকল সম্পদের মালিক জনগণ, শাসকরা সে সম্পদের রক্ষক মাত্র।

খলীফা ছেলের মুখ থেকে খেজুর কেড়ে নিয়ে রাজকোষে দিলেন

খলীফা উমার ইবন আবদুল আযীযের কাছে বাইতুলমালের জন্যে কিছু খেজুর এলো। তাঁর শিশুপুত্র সেখান থেকে একটা খেজুর নিয়ে মুখে পুরে দিল। তিনি দেখতে পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই তার গাল থেকে খেজুর বের করে বাইতুলমালের ঝুড়িতে রেখে দিলেন। ছেলে কাঁদতে কাঁদতে মায়ের কাছে চলে গেল।

বাড়ী ফিরে খলীফা স্ত্রীর মলিন মুখ দেখে বললেন, 'ছেলের মুখ থেকে খেজুর কেড়ে নেবার সময় আমার কলিজা ছিঁড়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কি করবো বলো। বাইতুলমাল জনসাধারণের সম্পত্তি। এতে জনসাধারণ হিসেবে আমারও অংশ আছে। কিন্তু ভাগ হবার পূর্বে কেমন করে আমি তা নিতে পারি?'

আরেক দিনের কথা। সানাআ থেকে একজন মহিলা খলীফার কাছে আরযি নিয়ে এলেন। সরাসরি খলীফার কাছে না গিয়ে তিনি খলীফার অন্তঃপুরে গেলেন। বারান্দায় বেগমের কাছে বসে নিজের সুখ-দুঃখের কাহিনী বলতে লাগলেন।

এমন সময় বাইরে থেকে এক ব্যক্তি ভেতরে এলো কূয়ার পানি তুলতে। পানির বালতি টানতে টানতে লোকটি বারবার বেগমের দিকে চাইছিল। বিদেশী মহিলার কাছে বড়ই দৃষ্টিকটু লাগল ব্যাপারটা। তিনি বেগমকে বললেন, গোলামটিকে বাইরে যেতে বলছেন না কেন, দেখছেন না আপনার দিকে কেমন বারবার তাকাচ্ছে।

বেগম একটু মুচকি হাসলেন।

কিছুক্ষণ পর খলীফার ডাকে বিদেশী মহিলাটি তার কাছে গিয়ে হাযির হলেন। খলীফাকে দেখে তিনি অবাক। এতো সেই ব্যক্তি, যে কূয়ার পানি তুলছিল। হায় হায়, পোশাকে আশাকে তো তাঁর চাইতেও গরীব মনে হচ্ছে খলীফাকে!

দামেস্ক।

ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী।

খলীফা উমার বিন আবদুল আযীযের শাসনকাল।

ঈদের মওসুম।

দামেস্কে ঈদের আনন্দ–উৎসবের সাড়া পড়ে গেছে। আমীর–উমরা, গরীব–মিসকীন সকলেই সাধ্যমত নতুন কাপড়–চোপড় তৈরী করে, রকমারি খাবার বানিয়ে উৎসবের আয়োজনে ব্যস্ত। আমীরদের ছেলে–মেয়েরা রঙিন পোশাক পরে আনন্দ করে বেড়াচ্ছে।

খলীফা অন্দর মহলে বসে আছেন। স্ত্রী ফাতিমা এসে উপস্থিত হলেন। স্বামীকে বললেন, 'ঈদ এসে গেল, কিন্তু ছেলেমেয়েদের নতুন পোশাক তো খরিদ করা হলো না।'

খলীফা বললেন,'তাই তো, কিন্তু কি করবো। তুমি যা আশা করছো, তা পূর্ণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব। প্রতিদিন খলীফা হিসেবে আমি যে ভাতা পাই তাতে সংসারের দৈনন্দিন খরচই কুলোয় না, তারপর নতুন পোশাক পরা, সে অসম্ভব।' ফাতিমা বললেন, 'তবে আপনি এক সপ্তাহের ভাতা বাবদ কিছু অর্থ অগ্রিম নিয়ে আমাকে দিন, তাই দিয়ে আমি ছেলেমেয়েদের কাপড় কিনে দিই।'

খলীফা বললেন, 'তাও সম্ভব নয়। আমি যে এক সপ্তাহ বেঁচে থাকবো তারই বা নিশ্চয়তা কি। আর কালই যে জনগণ আমাকে খলীফার পদ থেকে সরিয়ে দেবে না, তাই বা কি করে বলি। তার চেয়ে এ বিলাস বাসনা অপূর্ণই থেকে যাক– তবু ঋণের দায় থেকে যেন সর্বদা মুক্ত থাকি।'

ইসলামী সাম্রাজ্যের খলীফা আবু জাফর আল–মানসূর।
প্রবল প্রতাপশালী খলীফা তিনি।

তিনি যেমন ভালোবাসেন তাঁর রাজ্যকে, তেমনি ভালোবাসেন রাজ্যের প্রতিটিনাগরিককে।

প্রতিটি নাগরিকের জীবন, সম্পদ ও অধিকার তাঁর কাছে পরম পবিত্র।

একদিন খলীফা আল–মানসূরকে জানানো হলো, একজন মুসলিম মহিলা নোভারী রাজ্যে বন্দী রয়েছে। এই খবর শোনার পরই খলীফা সসৈন্যে নোভারী রাজ্যের দিকে যাত্রা করলেন। নোভারীর রাজা গার্সিয়া অদম্য আল–মানসূরের এই অভিযানে ভীত হয়ে পড়লেন এবং আল–মানসূরের কাছে দূত পাঠিয়ে বললেন, "খলীফা যে তাকে শাস্তি দিতে আসছেন, তার অপরাধ কি?"

আল–মানসূর গর্জন করে দূতকে বললেন, "কি, আপনার মনিব কি আমার কাছে শপথ করে বলেননি যে, কোন মুসলমান বন্দী তাঁর দেশে নেই। এখন আমি জানতে পেরেছি একজন মুসলিম মহিলা তাঁর দেশে আছে। আমি নোভারী থেকে যাব না যতক্ষণ না আপনার মনিব ঐ মহিলা বন্দীকে আমার হাতে ফেরতদেন।"

এই খবর পেয়ে গার্সিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মহিলা বন্দীকে এবং সেইসাথে খুঁজে পেয়ে আরও দু'জন মুসলিম বন্দীকে আল–মানসূরের কাছে ফেরত পাঠালেন এবং শপথ করলেন যে, কোন মুসলিম বন্দীই আর তাঁর দেশে নেই।

বিরুদ্ধে রায় পেয়ে খলীফা পুরস্কৃত করলেন কাযীকে

ইসলামী সাম্রাজ্যের অত্যন্ত শক্তিমান ও প্রবল প্রতাপশালী খলীফা আল-মানসূর।

ঐতিহাসিকরা একবাক্যে তাঁকে নিষ্ঠুরতার প্রতিমূর্তি হিসেবে অভিহিত করেছেন।

এ সত্ত্বেও সংযম ও নীতি-নিষ্ঠতার জন্যে তিনি ইতিহাসে স্থান রেখে গেছেন।

৭৭৫ খৃষ্টাব্দের কথা। খলীফা আল-মানসূর রাজধানী বাগদাদ থেকে মদীনায় এলেন। মুহাম্মাদ বিন ইমরান তখন মদীনার কাযী।

কাযী সেদিন তাঁর বিচারাসনে আসীন ছিলেন। এমন সময় একজন উট চালক আদালতে এসে খলীফার বিরুদ্ধে একটি সুস্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন করে সুবিচার প্রার্থনা করল।

অভিযোগ শুনেই কাযী মুহাম্মাদ বিন ইমরান তাঁর সহকারীকে খলীফার নামে কোর্টে হাযির হবার জন্যে লিখিত সমন পাঠাবার নির্দেশ দিলেন। তাঁর সহকারী এই আদেশের ব্যাপারে একটু নরম হবার জন্যে অনুরোধ করলেন। কিন্তু কাযী রাযী হলেন না।

অবশেষে তাঁর সহকারী লিখিত সমন পাঠালেন খলীফার কাছে।

খলীফা আল-মানসূর কাযীর সমন পেলেন। সমন পড়ে সভাসদদের বললেন, 'কাযীর আদালত থেকে সমন পেয়েছি। আমি সেখানে যাচ্ছি, কেউ আমার সাথে যাবে না। এটা আমার ইচ্ছা।'

যথা সময়ে খলীফা কাযীর আদালতে হাযির হলেন। কাযী তাঁর আসন থেকে উঠলেন না। খলীফার প্রতি কোন প্রকার ভ্রূক্ষেপ না করে তিনি তাঁর কাজ করে যেতেলাগলেন।

খলীফার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিচার শুরু হলো। কাযীর বিচারে খলীফার বিরুদ্ধে রায় গেল।

যখন বিচারের রায় ঘোষণা করা হলো, খলীফা আনন্দে চিৎকার করে উঠলেন এবং কাযীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এই রায়ের জন্য আল্লাহ আপনাকে বিরাট পুরস্কারে পুরস্কৃত করুন। আর আমি আপনার জন্যে ১০ হাজার দিরহাম পুরস্কার ঘোষণা করছি।'

উপহার ফিরিয়ে দিলেন উমার ইবনে আবদুল আযীয

বার শ' বাহাত্তর বছর আগের কথা।

ইসলামী দুনিয়ায় তখন উমাইয়া খলীফাদের শাসন।

উমাইয়া বংশের উমার বিন আবদুল আযীয দামেস্কের সিংহাসনে আসীন।

একদিনের ঘটনা। খলীফা উমার বিন আবদুল আযীযের কাছে উপহার এলো। আপেলের উপহার। আপেলের পক্কতা এবং সুমিষ্ট গন্ধে খলীফা খুবই খুশী হলেন। আপেল কিছুক্ষণ নেড়ে-চেড়ে তিনি আপেল মালিকের কাছে ফেরত পাঠালেন। সেখানে উপস্থিত একজন এটা দেখে অনুযোগ করে বললেন, 'খলীফা, মহানবী (সা) তো এরূপ উপহার গ্রহণ করতেন।' উত্তরে খলীফা বললেন, 'এরূপ উপহার আল্লাহর নবীর কাছে সত্যই উপহার, কিন্তু আমাদের বেলায় এ ঘুষ।'

খলীফার উপঢৌকন ও ইমাম আবু হানিফা

স্বেচ্ছাচারী শাসকের অধীনে কোন চাকুরী নেয়া কিংবা তাকে কোন সহযোগিতা করা ইমাম আবু হানিফা ঠিক মনে করতেন না।

শাসকদের বিশেষ কোন আনুকূল্যও তিনি চাইতেন না। এমনকি তাঁদের কোন উপঢৌকন তিনি স্পর্শ করতেন না।

খলীফা আল-মানসূর একবার ইমাম আবু হানীফাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি তো আমার উপহার গ্রহণ করেন না।"

জবাবে আবু হানীফা বললেন, "আমীরুল মুমিনীন, আপনি নিজের সম্পদ থেকে কবে আমাকে দিয়েছেন যে আমি তা গ্রহণ করিনি? আপনি তো মুসলমানদের বাইতুলমাল থেকে আমাকে দিয়েছেন যাতে আমার কোন হক নেই। তাদের প্রতিরক্ষার জন্য আমি লড়ি না। কাজেই একজন সিপাহীর মতো প্রাপ্য আমার নেই। আমি মুসলিম সমাজের কোন শিশু-কিশোর নই যে, তাদের জন্য বরাদ্দ প্রাপ্য আমি বাইতুলমাল থেকে পাবো। আমি কোন ফকীর-মিসকীনও নই যে, তাদের মতো অধিকার আমি লাভ করবো।"

ইমাম আবু হানিফা খলীফার কাছে হাত পাতলেন

ইমাম আবু হানিফা (র)–এর একজন মুচি প্রতিবেশী ছিলো। মুচি তার ঘরের দরজায় বসে সারাদিন কাজ করতো এবং সারারাত ধরে মদ খেয়ে মাতলামি করতো এবং অশ্লীল হৈচৈ ও গন্ডগোল করে ইমামের মনোযোগ নষ্ট করতো।

এক রাতে ইমাম মুচির ঘর থেকে হৈচে শুনলেন না। সে রাতে তিনি নিরিবিলি ইবাদত করতে পারলেন, কিন্তু মনে শান্তি পেলেন না।

পরদিন খুব সকালে ইমাম মুচির ঘরে গেলেন এবং মুচির খোঁজ নিতে গিয়ে জানতে পারলেন যে, তার মদ খেয়ে মাতলামির জন্যে পুলিশ তাকে ধরে নিয়ে জেলেপুরেছে।

খলীফা মানসুর তখন রাষ্ট্র ক্ষমতায়। ইমাম আবু হানিফা (র) কোন দিন কোন ব্যাপারেই খলীফার দ্বারস্থ হননি। বরং খলীফাই মাঝে মাঝে তাঁর দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু আজ প্রতিবেশীর বিপদ তাকে অস্থির করে তুলল এবং তিনি দরবারে গিয়ে হাযির হলেন।

দরবারের দ্বাররক্ষকরা মহান অতিথির সম্মানে দ্বার খুলে দিলেন। ইমামকে দেখে দরবারের আমীর–উমারাদের চোখ বিসফারিত হলো এবং স্বয়ং খলীফা আসন থেকে উঠে তাঁর দিকে অগ্রসর হলেন। তিনি ইমামকে নিয়ে তাঁর আসনে বসালেন এবং জানতে চাইলেন, কষ্ট করে তাঁর এ আগমনের কারণ কি?

ইমাম বললেন, 'আপনার পুলিশ আমার একজন প্রতিবেশীকে গ্রেফতার করে জেলে পুরেছে। আমি তার মুক্তির প্রার্থনা নিয়ে এসেছি।'

খলীফা একটু চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, 'হে সম্মানিত ইমাম। শুধু তাকে নয়, আপনার সম্মানে ঐ জেলের সবাইকেই আমি মুক্তি দিলাম।'

ইমাম আবু হানিফা (রা) তাঁর প্রতিবেশীকে নিয়ে ফিরে এলেন। প্রতিবেশী ঐ মুচি এরপর আর কোনদিন মদ স্পর্শ করেনি।

চাকুরীর চেয়ে শাস্তিই পছন্দ করলেন ইমাম আবু হানিফা

খলীফা আল–মানসূর ইমাম আবু হানীফাকে উচ্চ পদমর্যাদা দান করে তাঁকে বশীভূত করতে চাইলেন। তিনি তাঁকে প্রধান বিচারপতির পদে নিযুক্ত করলেন। কিন্তু ইমাম সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যাখ্যান করলেন।

খলীফা অপমানিত বোধ করলেন এবং ভীষণ ক্রুদ্ধ হলেন। সরকারী নির্দেশ না মানার অভিযোগে ইমাম কঠোর শাস্তির মুখোমুখি হলেন। শাস্তি হিসেবে শাহী জল্লাদ তাকে নির্মমভাবে প্রহার করলো। তিরিশটি কোড়ার আঘাত তাঁর পিঠে করা হলো। শরীর তাঁর ফেটে গেল। শিরাগুলো ছিঁড়ে রক্তের স্রোত বইল দেহ থেকে। খলীফা আল–মানসূরের চাচা খলীফাকে তিরস্কার করে বললেন, 'হায় হায়! তুমি এ কি করলে, এক লাখ উন্মুক্ত তরবারি তোমার মাথার উপর বিছিয়ে নিলে। আবু হানীফা হচ্ছে ইরাকের ফকীহ, সমস্ত পূর্ব ও পশ্চিমের তথা সারা বিশ্বের ইমাম।'

এ কথায় খলীফা আল–মানসূর লজ্জিত হলেন এবং তিনি ক্ষতিপূরণ দিতে চাইলেন। প্রত্যেক কোড়ার জন্যে এক হাজার দিরহাম হিসেবে তিরিশ হাজার দিরহাম তাঁর কাছে পাঠালেন।

কিন্তু তিনি তা নিতে চাইলেন না। বলা হলো, 'এগুলো আপনি নিজে না রাখেন খয়রাত করে দিন।' ইমাম জবাব দিলেন, 'খলীফার কাছে কি কোনো হালাল অর্থ আছে যা নিয়ে আমি খয়রাত করবো?'

সেনাপতি তারিক ফেরার জাহাজে পুড়িয়ে দিলেন

স্পেনের আকাশে-বাতাসে তখন গথিক শাসনে নিষ্পেষিত মানুষের আর্তনাদ। স্পেনের অত্যাচারিত জনগণ গোপনে মুসলিম সেনাধ্যক্ষ মূসার নিকট আবেদন পাঠাল, অত্যাচারের হাত থেকে আমাদের ত্রাণ করুন। মূসা ছিলেন উত্তর আফ্রিকায় খলীফা ওয়ালিদের প্রতিনিধি। ৭১১ সালে মূসার আহবানে তারিক সাগরের তীরে এক পর্বতের বুকে এসে পৌছলেন। তারিকের নাম বহন করে আজ পর্যন্ত এই স্থান জাবালে তারিক (তারিকের পর্বত) বা জিব্রালটার নামে খ্যাত। সাগর পার হয়ে তারিক স্পেনের ভূমি স্পর্শ করলেন। নবসূর্যের রশ্মিপাত এই প্রথম স্পেনের ভূমিদেশকে অভিনন্দিত করল।

স্পেনরাজ রডারিক এই মুষ্টিমেয় মুর সৈন্যের আবির্ভাবে তিলমাত্র বিচলিত হলেন না। তাঁর বিপুল সৈন্য-সামন্ত যে অতি সহজেই এ নবাগত মূরদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে সে বিষয়ে তাঁর সন্দেহ ছিল না।

তারিক দেখলেন, তাঁর দুঃসাহসী রোমাঞ্চপ্রিয় বীর সৈনিকদের মনেও দ্বিধা উপস্থিত হয়েছে। স্পেনের এত সৈন্যবল, তাঁর সম্মুখে কি তারা?

তারিক সৈন্যদের এই বিচলিত ভাব দেখে এক অদ্ভুত কাজ করে বসলেন। যে সকল তরীতে তিনি তাঁর সৈন্যসহ জিব্রান্টার প্রণালী পার হয়েছিলেন, তা সমস্ত নষ্ট করে ফেললেন।

তিনি পিছনের পথ বন্ধ করে মুর সৈন্যদের সম্বোধন করে বললেন, 'বন্ধুগণ, অনন্ত গভীর সমুদ্র আমাদের পেছনে গর্জন করে চলেছে। আজ যদি কাপুরুষের মত ফিরে যাই তবে সাগরের অতলগর্ভে আমাদের ডুবে যেতে হবে। আর যদি দেশ, জাতি ও ধর্মের গৌরব রক্ষা করে সত্যের পতাকা উড়িয়ে দিয়ে এগিয়ে চলে জয়লাভ করি, তবে জয়মালা আমাদের বরণ করে নেবে। নয়ত মৃত্যুবরণ করে শহীদের দরজা লাভ করবো। এই জীবন-মরণ সংগ্রামে কে আমার অনুগামী হবে?

সকলেই সেনাপতির আহবানে এক বাক্যে সম্মতি জানালো। 'আল্লাহু আকবর' আল্লাহ মহান- এই ধ্বনি করতে করতে মুর সৈন্য বিপুল স্পেনীয় বাহিনীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লো। সে প্রচন্ড আক্রমণের তীব্রতা সহ্য করতে না পেরে স্পেন বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো।

স্পেন বিজয়ী তারিকের অপূর্ব শৌর্যবীর্য ও সাহস দেখে স্পেন সেনাপতি থিওডমির বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়ে রাজা রডারিককে লিখে পাঠালেন, "সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও এই অদ্ভুত শৌর্যবীর্যের অধিকারী নবাগতদের অগ্রগতি আমি কিছুতেই রোধ করতে পারলাম না।"

আল–মানসূরের এক বিজয় অভিযান

একদা স্পেনের মুসলিম সেনাপতি আল–মানসূর তাঁর এক অভিযানে একটি সংকীর্ণ এলাকা দিয়ে খৃষ্টান এলাকায় ঢুকে গেলেন। তাঁর যাবার পরেই খৃষ্টানরা সে এলাকা দখল করে ফেললো। মুসলিম বাহিনী দৃশ্যত অবরুদ্ধ অবস্থায় ভীষণ বিপদে পড়ে গেল।

কিন্তু অদম্য মনোবলের অধিকারী আল–মানসূর অধিকৃত এলাকায় নিশ্চিন্ত মনে বাড়ী উঠাবার নির্দেশ দিলেন এবং সৈন্যদের চাষাবাদে লাগালেন। খৃষ্টানরা মুসলিম সেনাপতির এ কান্ড দেখে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলো। আল–মানসূর বললেন, সৈন্যরা বললো যে, 'বাড়ী ফেরার আগে তারা কিছু চায়। অবশ্য আর সময় ওরা পাবে না– অভিযানের সময় হয়েছে।'

মুসিলিম সেনাপতির এমন নিশ্চিত, অবিচলিত ও দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তি শুনে খৃস্টানরা ভয় পেয়ে গেল। তারা আল–মানসূরের অনুকূল শর্তে সন্ধি করলো এবং তারা মুসলিম সৈন্যদের ভারবহনকারী অনেক পশু সরবরাহ করে তাদের স্বদেশ যাত্রাকে সহজ ও আরামদায়ক করে দিল।

শাসক আল–মানসূর প্রিয় ঢাল রক্ষকের বিচার করলেন

স্পেনের নাবালক সুলতান দ্বিতীয় হিশামের সময় রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন আল–মানসূর। তাঁর কৃতিত্বের জন্যে ঐতিহাসিকরা তাঁকে 'দশম শতাব্দীর বিসমার্ক' বলে অভিহিত করেছেন। ঐতিহাসিক ডোজি বলেছেন, 'শুধু দেশ নয়, সভ্যতাও তাঁর কাছে ঋণী।'

আল–মানসূর ন্যায়–বিচারক হিসেবেও ছিলেন বিখ্যাত। বিচারে তিনি ব্যক্তিকে দেখতেন না, দেখতেন ন্যায়– নীতিকে।

একদিনের ঘটনা।

একজন সাধারণ মানুষ আল–মানসূরের কাছে গিয়ে অভিযোগ করলো, 'হে ন্যায়বিচারক, আপনার ঢালরক্ষক, যাকে আপনি প্রভূত সম্মান দিয়েছেন, আমার সাথে চুক্তি ভংগ করেছে। বিচারের জন্যে কাযীর এজলাসেও তাকে হাযির করা যায়নি।'

আল–মানসূর চিৎকার করে বললেন, 'কি! সে কোর্টে হাযির হতে অস্বীকার করেছে। আর কাযী তাকে হাযির হতে বাধ্য করেনি?'

আল–মানসূর ঢালরক্ষককে বললেন, 'তুমি তোমার পরবর্তী লোককে তোমার দায়িত্ব দিয়ে বিনীতভাবে গিয়ে কাযীর দরবারে হাযির হও।'

তারপর তিনি পুলিশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই দুই লোককে কাযীর কাছে নিয়ে যাও। কাযীকে গিয়ে বলো, আমার ঢালরক্ষক একজনের সাথে চুক্তি ভংগ করেছে, তার উপযুক্ত শাস্তি আমি চাই।'

বাদী লোকটি তার মামলায় জিতে গেল। সে ধন্যবাদ জানানোর জন্যে আল–মানসূরের কাছে এলো। আল–মানসূর বললেন, 'তোমার ধন্যবাদ থেকে আমাকে রক্ষা কর। ভাল, তুমি তোমার মামলা জিতেছ এবং সন্তুষ্ট হতে পেরেছ। কিন্তু আমি সন্তুষ্ট হতে পারছি না। আমার চাকরিতে থেকে যে আইন সে লংঘন করেছে, তার শাস্তি তার বাকী আছে।'

বিবেক যখন সচেতন থাকে

একদা স্পেনের শাসক আল-মানসূর কিছু বন্দীর প্রতি ক্ষমা ঘোষণার হুকুম দিলেন। সেই বন্দীদের তালিকার প্রতি তিনি যখন নজর বুলাচ্ছিলেন, তখন তালিকার একটা নামের উপর তাঁর চোখটা আটকে গেল। ঐ লোকটির সাথে তাঁর প্রবল শত্রুতা ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ এ বন্দীর নামের পাশে লিখে দিলেন, মৃত্যু যতদিন একে গ্রাস না করে ততদিন একে বন্দী করে রাখ।

কিন্তু সে রাতে আল-মানসূর ঘুমাতে পারলেন না। বিবেকের দংশনে তিনি ক্ষত-বিক্ষত হতে লাগলেন। আধা-ঘুম, আধা-জাগরণের মধ্যে তিনি দেখলেন, কে একজন তাঁকে বলছে, 'সেই মানুষটিকে ছেড়ে দাও অথবা ঐ লোকটির প্রতি যে অবিচার করেছ তার জরিমানা আদায় কর।'

অবশেষে আল-মানসূর ঐ রাতেই লোকটির ফাইল আনিয়ে নিলেন এবং তাতে এই নির্দেশ লিখলেন ঃ "বন্দী মুক্ত। এই বন্দীর মুক্তির জন্যে সব প্রশংসা আল্লাহর।"

তাউস এবং শাসকের একটি চাদর

তাউস ইবনে কাইসান ছিলেন একজন বড় আলেমে দ্বীন। ইয়েমেনের কোনো এক শহরে তিনি বসবাস করতেন। শাসক ও ক্ষমতাসীনদের অনুগ্রহ কখনো বরদাশত করতেন না তিনি।

একবার তিনি ওহাব ইবনে মাজবাহর সাথে হাজ্জাজ ইবনে ইউসূফের ভ্রাতা মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফেরও ওখানে যান। শীতের মওসুম। মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফ তাঁর শরীরে একটা চাদর পরিয়ে দিলেন। কিন্তু সে চাদর তিনি শরীর থেকে ফেলে দিলেন। মুহাম্মাদ ক্রোধে ফুলে উঠলেন। কিন্তু তাউস তার কোন পরওয়াই করলেন না।

সেখান থেকে বিদায়ের পর ওহাব ইবনে মাজবাহ বললেন, 'আপনি অন্যায় করেছেন। চাদর আপনার প্রয়োজন না থাকলেও মুহাম্মাদ ইবনে ইউসূফের ক্রোধ থেকে লোকদের বাঁচানোর জন্য তখন চারদটা গায়ে রাখাই ভালো ছিল। পরে তা বিক্রি করে মিসকিনদের মধ্যে তার মূল্য বন্টন করে দিতে পারতেন।'

তাউস বললেন, 'তুমি যা স্বাভাবিক তাই বলেছ, কিন্তু তুমি কি জান না, আজ যদি আমি এ চাদর গ্রহণ করতাম তবে আমার এ কাজ জনগণের জন্য সনদ ও দলিলে পরিণত হতো।"

ঐতিহাসিক ওয়াকেদি এবং খলীফা মামুনের দানশীলতা

আরব ঐতিহাসিক ওয়াকেদি আব্বাসীয় খলীফা মামুনের অধীনে একজন বিচারক ছিলেন। তিনি তাঁর দানশীলতার জন্যে বিখ্যাত ছিলেন– যেমন মামুন ছিলেন জ্ঞান–বিজ্ঞানের বিরাট সহযোগী।

এমনকি ওয়াকেদি ঋণ করেও দান করতেন। এইভাবে তিনি বিরাট ঋণে জড়িয়েপড়লেন।

একদিন ওয়াকেদি মামুনকে লিখলেন, 'আমি আমার ঋণ নিয়ে বড় বিপদে পড়েছি।'

খলীফা মামুন তাঁর স্বহস্তলিখিত পত্রে তাঁকে বললেন, 'আপনার দু'টি বড় গুণ রয়েছে ঃ একটা হলো দানের হাত, অপরটি প্রয়োজন। প্রথম গুণটি আপনাকে অপরিমিত খরচে বাধ্য করে। আর দ্বিতীয়টি আপনার যা ঋণ বা প্রয়োজন তার একটি অংশমাত্র প্রকাশে সুযোগ দিয়েছে। তাই আমি নির্দেশ দিয়েছি যা আপনি চেয়েছেন তার দ্বিগুণ আপনাকে দেবার জন্যে। এ দিয়েও যদি আপনার প্রয়োজন পূরণ না হয়, তাহলে দোষ আপনার। আর যদি এটা প্রয়োজন পূরণে যথেষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আগের চেয়েও মুক্তহস্ত হতে আপনার বাধা নেই। কারণআল্লাহ দানশীলতাকেভালোবাসেন।'

অষ্টম শতকের শেষ ভাগ। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের সিংহাসনে আরোহণ করেছেন নিসোফোরাস। শক্তিগর্বে অন্ধ হয়ে তিনি বাগদাদের খলীফাকে পূর্ব নির্ধারিত কর দেয়া বন্ধ করে দিলেন। কর বন্ধ করেই তিনি ক্ষান্ত হলেন না। এক ঔদ্ধত্যপূর্ণ পত্রে তিনি লিখলেন, 'পূর্বে আপনাকে যে সমস্ত মণি–মুক্তা দেয়া হয়েছে তা অবিলম্বে ফেরত পাঠাবেন। নয়তো অস্ত্রই এর মীমাংসা করবে।'

খলীফা উত্তরে শুধু লিখলেন, 'চিঠির উত্তর চোখেই দেখতে পাবে।'

নিসোফোরাসের পত্রের উত্তর দিতে খলীফা হারুনুর রশীদ সেই দিনই বিপুল সৈন্য বাহিনী নিয়ে অগ্রসর হলেন।

হেকক্রিয়াতে ভীষণ যুদ্ধ হলো। খৃষ্টান শক্তি শোচনীয় পরাজয় বরণ করলো। নিসোফোরাস ভীত হয়ে পূর্বের চাইতে অধিক কর দিতে সম্মত হয়ে সন্ধি ভিক্ষা করলেন।

খলীফা নিসোফোরাসের রাজ্য ততদিনে প্রায় অর্ধেক গ্রাস করে ফেলেছেন। তবু তিনি এক শর্তে সন্ধি করতে রাজি হলেন।

এক অপূর্ব শর্ত। পৃথিবীর কোন যুদ্ধে এরূপ শর্তে সন্ধি হয়নি। খলীফা বলে পাঠালেন, 'আপনার রাজ্যে সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে যে সমস্ত পুস্তক আছে তার এক একটি কপি আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। পরিবর্তে আমি আপনার রাজ্যের অর্ধেক অংশ আপনাকে ফিরিয়ে দেব।'

রাজ্যের পরিবর্তে পুস্তক। অদ্ভুত শর্ত। কিন্তু জ্ঞানের সাধক বাগদাদের খলীফার পক্ষেই এইরূপ শর্ত প্রদান সম্ভব। খলীফা এশিয়া মাইনরে দলে দলে পন্ডিত পাঠালেন। বহুদিনের পরিশ্রমের পরে তারা খলীফাকে বহু মূল্যবান পুস্তক পাঠিয়েদিলেন।

রাজার থাকে রাজ্য, থাকে শক্তি।

রাজাকে মান্য করে কেউ ইচ্ছায়, অনেকেই অনিচ্ছায়। যেখানে ভয় মান্য করার মানদন্ড, সেখানে ভালোবাসা থাকেনা।

জ্ঞানীরা, আলেমরা, নিঃস্বার্থ ধর্মনেতারা রাজ্যহীন রাজা। মানুষের হৃদয়ে তাঁদের সাম্রাজ্য, তাই মানুষের হৃদয়ে সীমাহীন ভালোবাসা তাঁদেরই জন্যে। যা রাজা-বাদশারা কল্পনা করতে পারেনা।

একবার বাদশা হারুন-অর-রশীদ রাজকীয় জাঁকজমক ও শান-শওকতের সাথে রুক শহরে অবস্থান করছিলেন। এমন সময় বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের আগমন ঘটল শহরে। শহরের সমস্ত লোক তাঁকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য বের হয়ে আসল। ভিড়ের চাপে অনেকের জুতা ছিঁড়ে গেল। বাদশাহর এক বাঁদী উপর থেকে এ দৃশ্য দেখছিল। সে জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি? কে এলো শহরে?' কে একজন তাকে জানাল, 'খুরাসান থেকে আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক নামে একজন আলিম এসেছেন।' বাঁদী বললো, 'আসল রাজত্ব তো এই ব্যক্তির- হারুনের নয়। কারণ পুলিশ ও সরকারী কর্মচারী ছাড়া বাদশাহর জন্য একটি লোকও জমা করা যায় না। অথচ এ ব্যক্তির আগমনে সমস্ত শহরটাই ভেঙ্গে পড়েছে।'

সন্তানের প্রতি সুলতান সালাহ্ উদ্দীন

সুলতান গাজী সালাহ উদ্দীন তাঁর পুত্র জহিরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদে নিয়োগের সময় বলেন ঃ

"হে আমার পুত্র, আমি তোমার মনোযোগকে সমস্ত মংগলের উৎস আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দিকে আকর্ষণ করছি। যেখানে বা যে কাজে তাঁর মঞ্জুরী আছে, সেখানেই শান্তি নিহিত। রক্তপাত থেকে বিরত থাকবে। এর উপর কখনও ভরসা করো না। কারণ যে রক্ত প্রবাহিত হয় তা কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করে যায় না। তোমরা জনগণের মন জয় করার চেষ্টা করবে, তাদের উন্নতির জন্য কাজ করবে। স্মরণ রেখ, তাদের মঙ্গল বিধানের জন্যই আল্লাহ তোমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন, আমার নিয়োগও এই জন্যই। আমি যদি উল্লেখযোগ্য কোনও কারণে হয়ে থাকি, তাহলে তা এই জন্যই যে, আমি ভদ্রতা ও দয়ার মাধ্যমে যথাসাধ্য মানুষের হৃদয় জয় করতে চেষ্টা করেছি।"

ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী তখন বাগদাদ।

আব্বাসীয় খলীফা আল–মানসূরের তখন শাসনকাল।

আল–মানসূরের অধীনে মিসর তখন সমৃদ্ধশালী ও সুখী একটি প্রদেশ।

ইসলামী বিচার–ব্যবস্থার তখনও স্বর্ণযুগ।

সে সময় মিসরে এক কাযী ছিলেন। ৭৬১ খৃষ্টাব্দে তিনি তাঁর পদে নিয়োগ লাভ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ধর্মভীরু। তিনি সরকারী কাজের জন্যে যে বেতন নিতেন, তা খরচের ব্যাপারে খুব হুঁশিয়ার ছিলেন। তিনি মনে করতেন, যে বেতন তিনি নেন, সেটা তাঁর সরকারী কাজের সময়ের জন্যে। সুতরাং তিনি যে সময় নিজের কাজ করতেন, সে সময়ের জন্যে বেতন নেয়াকে তিনি হক মনে করতেন না। তাই দেখা যেত, তিনি যখন নিজের কাপড় কাচতেন কিংবা কোন জানাযায় যেতেন বা নিজের কোন কাজ করতেন, তখন হিসেব করে সে সময়ের পয়সা বেতন থেকে বাদ দিতেন।

তিনি তাঁর বিচার কাজের অবসরে, প্রতিদিন দু'টি করে ঘোড়ার মুখের সাজ তৈরি করতেন। দু'টি সাজের একটির বিক্রয়লব্ধ টাকা তিনি নিজের জন্য খরচ করতেন, অপরটির টাকা আলেকজান্দ্রিয়ায় তাঁর এক বন্ধুর নামে পাঠাতেন, যিনি কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদে লিপ্ত ছিলেন।

সুলতান সালাহ্ উদ্দীন এবং এক শত্রু শিশু

মুসলিম এবং খৃষ্টান ক্রুসেডারদের মধ্যে আক্রায় তখন ঘোরতর যুদ্ধ চলছিল। এ সময় একদিন একজন খৃষ্টান মহিলা কাঁদতে কাঁদতে তাঁবু থেকে বেরিয়ে সুলতান সালাহ উদ্দীনের তাঁবুর দিকে ধাবিত হলো। কিন্তু তাঁবুতে পৌঁছার আগেই প্রহরীরা তাকে থামিয়ে দিল। মহিলাটি প্রহরীর প্রতি করুণ আবেদন জানিয়ে বলল, 'আমাকে সুলতানের নিকট নিয়ে চলুন।' প্রহরী মহিলার আবেদনে নরম হয়ে সুলতানের কাছে নিয়ে গেল।

ক্রন্দনরত মহিলাকে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন, তার কি হয়েছে। মহিলাটি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, "আমার শিশু সন্তানকে মুসলিম সৈন্যরা ধরে এনেছে।" এ কথা শুনে সুলতান খুব ব্যথিত হলেন এবং শিশুটিকে খুঁজে এনে দেয়ার জন্য তৎক্ষণাৎ নির্দেশ দিলেন। সহজে শিশুটি পাওয়া গেল। সন্তানকে ফেরত পেয়ে মা আনন্দিত হলো। প্রহরীরা তখন সন্তানসহ মহিলাকে খৃষ্টান তাঁবুতে পৌঁছে দিল।

গজনীর সুলতান সবুক্তগীন। মাহমুদ তাঁর সন্তান।

গজনীর কাছে শাহজাদা মাহমুদ একটি মনোরম বিনোদন প্রাসাদ তৈরী করেছিলেন। যখন এর নির্মাণ সমাপ্ত প্রায়, তখন একদিন তিনি তাঁর পিতা সবুক্তগীনকে এই বাড়ীটি দেখার জন্য আমন্ত্রণ করলেন।

তাঁর পিতা সবুক্তগীন সভাসদসহ সেই প্রাসাদ দেখতে এলেন। আমন্ত্রিতদের সকলেই সেই প্রাসাদের বিভিন্ন দিক, বিভিন্ন কাজের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। কিন্তু মাহমুদ পিতার মন্তব্য কি তা জানার জন্য উদগ্রীব ছিলেন।

প্রাসাদ পরিদর্শন শেষে সুলতান সবুক্তগীন বললেন, "আমার বিবেচনায় গোটা জিনিসটাই একটা খেলনা। দেশের যে কোন প্রজাই অর্থ খরচ করে এ ধরনের প্রাসাদ গড়তে পারে। একজন শাহযাদার প্রকৃত কাজ হলো সুকর্ম-সুখ্যাতির এমন ভিত রচনা করা যা যুগ যুগ ধরে অনুকরণ করা হবে এবং কারও পক্ষে অনায়াসে যা অতিক্রম করা দুরূহ হবে।"

এই শাহাযাদা মাহমুদই পরবর্তীকালের মহান বিজেতা সুলতান মাহমুদ।

ফকিরের দরবারেই সুলতান হাযির হলেন

গজনীর সুলতান মাহমুদ একদিন সমরখন্দের খারকান গ্রামে গেলেন। শেখ আবুল হাসান নামে একজন বুযর্গ ব্যক্তি সেখানে বাস করতেন। সুলতানের ইচ্ছা তাঁরই সাথে দেখা করা।

তিনি সেখানে পৌছে বুযর্গ ব্যক্তিকে অনুরোধ করে পাঠালেন তাঁর তাঁবুতে আসারজন্য।

সুলতানের বেয়ারা যখন সুলতানের বার্তাটি ঐ বুযর্গ ব্যক্তিকে দিলেন, তখন তিনি বললেন, 'আমি উপরের মহারাজাধিরাজের হুকুম পালনে এতই ব্যস্ত যে, অধঃস্তন এই রাজার হুকুম পালনের জন্য আমার সময় নেই বলে আমি দুঃখিত।'

সুলতান মাহমুদ যখন এই খবর শুনলেন তিনি অভিভূত হয়ে পড়লেন এবং বললেন, 'উঠ তোমরা, আমরাই তাঁর কাছে যাব। তিনি এখানে আসবেন এমন মানুষ তিনি নন।

সুলতান শেখ আবুল হাসানের কাছে গেলেন এবং তাঁকে অভিনন্দন জানালেন। শেখ স্বাগত জানালেন সুলতানকে। কিন্তু আসন থেকে উঠলেন না। সুলতান তাঁর কাছে কিছু উপদেশ চাইলেন। শেখ বললেন, 'মসজিদে নামায পড়বে, দান করবে এবং নিজ জনগণকে ভালবাসবে।'

সুলতান তাঁর আশীর্বাদ চাইলেন। শেখ বললেন, 'তুমি সর্বশেষ মাহমুদের (প্রশংসিতের) সাথে থাক।'

সুলতান এক থলে টাকা শেখের সামনে রাখলেন। শেখ এক খন্ড বার্লির রুটি তুলে নিয়ে সুলতানকে বললেন, 'খাও।' সুলতান মুখভরে রুটি চিবালেন কিন্তু গিলতে পারলেন না। শেখ বললেন, 'এই বার্লির রুটি যেমন তোমার গলায় বাধছে, তোমার স্বর্ণ মুদ্রাগুলো তেমনি আমার গলায় বাধবে।' এই স্বর্ণ মুদ্রাগুলো নিয়ে যাও এবং দরিদ্রদের মধ্যে বিলি করে দাও।

৮১৪ খৃষ্টাব্দের কথা।

হাকাম তখন স্পেনের শাসক।

কর্ডোভায় এক ভয়ানক বিদ্রোহ দেখা দিল। বিদ্রোহীরা সমুদ্র গর্জনের মত ভয়নাক রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছে।

হাকাম ঘোড়সওয়ার এক বাহিনীকে নির্দেশ দিলেন ওদের প্রতিরোধ করতে। কিন্তু তারা পরাজিত হয়ে ফিরে এলো। তাঁর প্রাসাদের রক্ষীরাও হতাশ ও আতংকিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু হাকামকে দেখা গেল অত্যন্ত শান্ত। চারদিকের উত্তপ্ত উত্তেজনার মধ্যে যেন তিনি একখন্ড বরফ। দরবারে বসেই তিনি তাঁর হেরেম থেকে মৃগনাভি আনালেন। তারপর তিনি চুল ও দাড়ি সুবিন্যস্ত করে তাতে মৃগনাভি লাগালেন।

তাঁর ঘনিষ্ঠ একজন সহচর চিৎকার করে বলে উঠল, 'জাহাঁপনা, আমাকে মাফ করুন, নিজকে সুগন্ধচর্চিত করার আশ্চর্য এক সময় আপনি বেছে নিয়েছেন। যে বিপদ আমাদের আতংকিত করছে তা কি আপনি দেখতে পাচ্ছেন না?'

হাকাম ধমক দিলেন, 'চুপ কর বোকা, যদি আমার মুখ মাথা সুগন্ধচর্চিত না করি, তাহলে কেমন করে বিদ্রোহীরা শত মাথার মধ্যে আমার মাথা চিহ্নিত করবে।?'

তারপর হাকাম পূর্ণভাবে অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সিংহাসন থেকে নামলেন। ধীর ও শান্তভাবে সেনাবাহিনী পরিদর্শন করলেন। তারপর তিনি তাঁর সৈন্যদের ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। বিদ্রোহীরা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পরাজিত হলো ও পশ্চাদপসরণকরল।

সুলতান মাহমুদ বাতি নিভিয়ে অপরাধীর শিরচ্ছেদ করলেন

সুলতান মাহমুদ ছিলেন পরাক্রমশালী শাসক এবং অতুলনীয় বিত্তবৈভবের মালিক।

কিন্তু শক্তি ও বিত্ত তাঁকে স্বেচ্ছাচারী করে তোলেনি। ন্যায়বিচারকে তিনি ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছার উর্ধে স্থান দিতেন।

একবার এক ব্যক্তি সুলতান মাহমুদের কাছে এসে নালিশ করল, তার সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হয়ে সুলতানের ভ্রাতুষ্পুত্র প্রায়ই তার গৃহে হানা দেয় এবং তাকে প্রহার করে বের করে দিয়ে তার স্ত্রীর উপর অবৈধ কামনা চরিতার্থ করে।

অভিযোগ শুনে ক্রোধে সুলতানের চোখ থেকে অশ্রুপাত হতে লাগল। তিনি বললেন, 'আবার যখন সে যাবে আমাকে খবর দিও।'

তিন দিন পর এক রাতে লোকটি ছুটে এসে খবর দিল সুলতানকে। সুলতান একাই তার সাথে ছুটলেন।

গিয়ে দেখলেন, ঘরে একটা মোমবাতি জ্বলছে আর তার ভ্রাতুষ্পুত্র লোকটির স্ত্রীর পাশে ঘুমিয়ে। সুলতান মোমবাতি নিভিয়ে দিয়ে তলোয়ারের এককোপে তার ভ্রাতুষ্পুত্রের শিরচ্ছেদ করলেন। তারপর সুলতান আলো আনিয়ে দ্রুত এক গ্লাস পানি ঢক ঢক করে পান করে ফেললেন।

লোকটি বিস্ময়ে সুলতানের কাছে জানতে চাইলেন কেন তিনি বাতি নিভিয়ে ছিলেন এবং কেনইবা পানি পানের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন।

সুলতান বললেন, 'ঐ যুবককে আমি খুব স্নেহ করতাম। ভয় হয়েছিল তার মুখ দেখলে আমি তার প্রতি স্নেহ প্রবণ হয়ে পড়ব। তাই বাতি নিভিয়ে ছিলাম। আর পানি পান করলাম কারণ, তোমার অভিযোগ পেয়ে শপথ করেছিলাম, অপরাধীকে শাস্তি না দিয়ে আমি আহার করবনা। আমি তিন দিন ধরে আহার করিনি।'

সুলতান মাহমুদ মূর্তি বিক্রেতা নয়

সুলতান মাহমুদ সতেরবার ভারতে অভিযান পরিচালনা করেছিলেন। তিনি যেমন জয় করেছিলেন বহু রাজ্য, তেমনি প্রভূত সম্পদও সংগ্রহ করেছিলেন।

অনেকেই তাঁকে সম্পদ লোলুপ বলে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু সম্পদের জন্যই তিনি অভিযানগুলো পরিচালনা করেছিলেন তা প্রমাণ হয়না।

সোমনাথ মন্দিরের ঘটনা।

সোমনাথ জয়ের পর সুলতান মাহমুদ সোমনাথ মন্দিরে প্রবেশ করলেন।

বিশাল সোমনাথ মন্দির।

পাঁচশ' নর্তকী, তিনশ' গায়ক এবং মন্দিরে প্রবেশের পূর্বে ভক্তদের মাথা মুন্ডনের জন্যেই ৩০০ নাপিত ছিল এ মন্দিরে।

সুলতান মন্দিরে প্রবেশের পর পাঁচ গজ দীর্ঘ বিশাল সোমনাথ মূর্তির নাক ভেঙে দিলেন এক আঘাতে। তারপর মূর্তিটি গুঁড়িয়ে দিতে উদ্যত হলে ব্রাহ্মণরা প্রস্তাব করল মূর্তিটি না ভাঙলে সুলতানকে তারা প্রচুর স্বর্ণ উপহার দেবে।

সুলতানের কতিপয় কর্মচারীও সুলতানকে বুঝাল, মূর্তি ভেঙে কি লাভ। তার চেয়ে স্বর্ণ পেলে তা দান করে দিলেও প্রচুর পুণ্য হবে।

সুলতান মাহমুদ হাসলেন তাদের প্রস্তাব শুনে।

তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, 'সুলতান মাহমুদ মূর্তি বিক্রেতা নয়, মূর্তি ধ্বংসকারী।'

মূর্তি ভাঙা হলো।

মূর্তির বিশাল পেট থেকে বের হলো প্রচুর হিরা, পদ্মরাগ মণি, অঢেল মুক্তা যার মূল্য ছিলো ব্রাহ্মণদের প্রতিশ্রুত উপহারের চেয়ে বহু বহু গুণ বেশী।

মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত উযীরের মা

হাসান ছিলেন সুলতান মাহমুদের একজন বিখ্যাত উযীর। সুলতান মাহমুদের সন্তান ও উত্তরাধিকারী সুলতান মাসুদের সময় তিনি ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন। তাঁকে বিদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হলো। তাঁকে লাঞ্ছিত করা হলো। অবশেষে প্রাণদন্ড দেয়া হলো।

পাগড়ী-পাজামা পরে উজ্জ্বল মুখ এবং দ্যুতিময় দেহ নিয়ে বিজ্ঞ আসামী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন। যারা হাযির ছিল, তারা কেউ এ বেদনাদায়ক মৃত্যুতে না কেঁদে থাকতে পারলো না।

শুধু কাঁদলো না হাসানের মা। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'আমার সন্তানের কি ভাগ্য। সুলতান মাহমুদ তাকে দিয়েছিল দুনিয়া আর মাসুদের মত সুলতান তাকে দান করলো আখিরাত।'

আফগানিস্তান, পারস্যসহ মধ্য এশিয়ার বিশাল অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত সেলজুক সুলতানদেরশাসন।

১০৭২ সাল।

সেলজুক বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সুলতান মালিক শাহ তখন ক্ষমতায়।

ছোট ভায়ের সাথে বিরোধ চলছিল মালিক শাহের। সিংহাসনের দাবী করে বিদ্রোহ করেছিল তাঁর ছোট ভাই।

সে সময়ের একটি ঘটনা।

সেলজুক সুলতান মালিক শাহ একদিন তাউস-এর একটা সমজিদ পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। মসজিদ থেকে বের হবার পথে তিনি প্রধান উজির নিজামুল মুলককে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি মসজিদে যে দোয়া করেছেন সেটা কি?'

নিজামুল মুলক বললেন, 'আমি দোয়া করেছি আল্লাহ যাতে আপনাকে আপনার ভাইয়ের উপর বিজয় দান করেন।'

মালিক শাহ বললেন, 'আর আমি কি দোয়া করেছি জানেন?' জিজ্ঞেস করার পর তিনিই উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকে আমি এটুকুই বলেছি, হে আল্লাহ। জনগণের জন্য যার শাসন মঙ্গলকর হবে, তাকেই আপনি শাসন ক্ষমতা দান করুন।'

পরিচারিকার কথায় কাঁপতে লাগলেন রাজা ইবরাহীম আদহাম

বলখের রাজা ইবরাহীম আদহাম একদিন পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে শিকারে গেলেন। সেই সময় রাজ প্রাসাদের এক দাসী বালিকা তার শয়নকক্ষে এলো এবং দেখল বেগম বাইরে গেছেন। রাজকক্ষের বহুমূল্য আসবাবপত্র, সুশোভিত বিছানা, আতরদানি থেকে আসা মনোহর সুগন্ধ সব মিলে দাসী–বালিকাকে আত্মহারা করে তুলল। সে ভুলে গেল নিজের অবস্থার কথা। তার লোভ হলো সে বিছানায় একটু শয়নের। সে সন্তর্পণে সেই রাজকীয় বিছানায় শুয়ে পড়ল এবং ঘুমিয়ে গেল।

ঘুমন্ত অবস্থায়ই তাকে ঐ রাজকীয় বিছানায় পাওয়া গেল। ইবরাহীম আদহাম শিকার থেকে ফেরার সাথে সাথেই এই গুরুতর ব্যাপারটা তাঁকে জানানো হলো। শুনে রাজা ভয়ানক ক্ষিপ্ত হলেন। একজন দাসী বালিকা তাঁর রাজ–বিছানা স্পর্শ করেছে এত বড় ঔদ্ধত্য।

ক্রুদ্ধ রাজা ইবরাহীম আদহাম নির্দেশ দিলেন, দাসী বালিকাটিকে ৫০টি বেত্রাঘাত করা হোক। যখন তার আদেশ প্রতিপালিত হলো, তখন রাজা বললেন, 'হে বালিকা, তুমি তোমার কৃতকর্মের জন্য নিশ্চয় দুঃখবোধ করছ?'

বালিকাটি উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, মহামান্য রাজা। কিন্তু আমি আমার নিজের অবস্থার চেয়ে আপনার জন্যেই বেশী দুঃখবোধ করছি।'

রাজা সরবে বললেন, 'কেন এই অমূলক চিন্তা করছ?'

বালিকা বলল, 'কারণ এক ঘন্টা আপনার বিছানায় শোয়ার জন্যে যদি আমার এই শাস্তি হয়ে থাকে, তাহলে বছরের পর বছর ঐখানে শোয়ার জন্যে আপনার কেমন শাস্তি হবে, তা ভেবে আমি দুঃখবোধ করছি।'

বালিকার এই কথা যেন রাজার উপর বিনা মেঘে বজ্রপাত ঘটালো। তিনি হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মুখের চেহারা বদলে গেল। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁর পরিচারকদের বললেন, "এই বালিকাকে নিয়ে যাও, তার ভালভাবে চিকিৎসা কর। আমাকে একাকী থাকতে দাও।"

দিল্লীর বাদশাহ নাসির উদ্দিন।

বাদশাহ আলতামাসের পুত্র তিনি।

বাদশাহর পুত্র হলেও স্বহস্তে পুস্তক নকল করে তার বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়ে তিনি জীবিকা নির্বাহ করতেন। দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পরও তিনি এভাবেই নিজ পরিবারের ব্যয় নির্বাহ করতেন।

তাঁর বেগম নিজ হাতে রান্না-বান্নাসহ সংসারের যাবতীয় কাজ করতেন।

একদিন রুটি সেকবার সময় বাদশাহর বেগমের হাত পুড়ে গেল।

বেগম এসে বললেন, 'বাদশাহ, একলা আর পেরে উঠিনে, একজন পরিচারিকার ব্যবস্থা করে দিন।' বাদশাহের চক্ষে দেখা দিল অশ্রু। তিনি বললেন, 'পরিচারিকা রাখার সংগতি আমার নেই। ধৈর্য ধরে কাজ করে যাও বেগম, আল্লাহ তার পুরস্কার দেবেন। দাসী রাখা অসম্ভব। রাজকোষ জনসাধারণের- আমি তার রক্ষক মাত্র। অনাবশ্যক ব্যয় বৃদ্ধি দ্বারা রাজ্যের ব্যয়ভার বৃদ্ধি করতে আমি পারব না।'

সুলতান বাহমানীর উচিত শিক্ষা

দক্ষিণ ভারতের বাহমনী রাজ্যের সুলতান আলাউদ্দিন শাহ বাহমানি (দ্বিতীয়) একজন বাগ্মী লোক ছিলেন। মাঝে মাঝে তিনি মসজিদে খুতবা দিতেন এবং বলতেন তিনি সংযমী, ন্যায়পরায়ণ, উদার ও দয়ালু রাষ্ট্রনায়ক।

একজন আরবীয় বণিক শাহ বাহমানির কাছে একটি ঘোড়া বিক্রয় করেছিলেন, কিন্তু দাম তখনও পাননি।

শাহ বাহমানির খুতবা দেয়ার সময় একদিন তিনি মসজিদে হাযির ছিলেন এবং রাজা নিজের যে প্রশস্তি গাইছিলেন তা শুনছিলেন। এসব কথা শুনে তার প্রতি দুর্ব্যবহার এবং নিরপরাধ সাইয়েদদের সাম্প্রতিক হত্যাকান্ডের কথা তাঁর মনে পড়ে গেলো। তিনি চিৎকার করে উঠলেন এই বলে- "আপনি না ন্যায়পরায়ণ, না দয়ালু, না ধৈর্যশীল, না উদার; বরং আপনি সত্যিকার মু'মিনের জন্য নির্দিষ্ট মসজিদের মিম্বর থেকে বাগাড়ম্বর প্রকাশের সাহস করছেন?"

শাহ বাহমানি তৎক্ষণাৎ ঐ বণিকের ঘোড়ার দাম ঐখানেই দিয়ে দিতে বললেন এবং তিনি প্রাসাদে চলে গেলেন। এরপর তিনি আর মসজিদের মিম্বরে উঠেননি।

১৫০১ খৃষ্টাব্দ। শেখ আবদুল্লাহ নামে একজন আরব ধর্ম প্রচারক মালয় উপদ্বীপের সর্ব উত্তর কুয়েদায় আসলেন। শেখ কুয়েদার রাজার সাথে দেখা করতে চাইলেন। সাক্ষাতের ব্যবস্থা হলো। তারপর দু'জনের মধ্যে নিম্নোক্ত কথোপকথন হলো ঃ

আবদুল্লাহ ঃ আপনার দেশের ধর্ম কি?

রাজা ঃ পূর্ব পুরুষের কাছ থেকে যা আমরা পেয়েছি সেটাই আমাদের ধর্ম। আপনার ধর্ম কি?

আবদুল্লাহ ঃ আমাদের ধর্ম স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে তাঁর রাসূলের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসেছে।

রাজা ঃ স্বয়ং আল্লাহর কাছ থেকে? ঐ ধর্মের নাম কি?

আবদুল্লাহ ঃ এর নাম ইসলাম। আমরা আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (সা)–এর মাধ্যমে এই ধর্ম পেয়েছি। সর্ব ধর্মের উপর এটা বিজয়ী হয়েছে।

রাজা ঃ তাহলে ঐ ধর্ম সম্পর্কে আমাকে কিছু বলুন।

শেখ আবদুল্লাহ ইসলামের শিক্ষা ও সৌন্দর্যের কিছু বিবরণ দিলেন। সংগে সংগে রাজা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করলেন। তাঁর সাথে সাথে অন্যান্য সভাসদ এবং প্রজারাও ইসলামে দীক্ষিত হলো।

তাপসী রাবেয়া বসরী ছিলেন পরিপূর্ণ সন্তুষ্ট হৃদয়।

তাঁর এ সন্তুষ্ট হৃদয়ে কোন অভাববোধ ছিলনা, তাই ছিলনা কোন অভিযোগও। চাইবারও ছিলনা কারও কাছে কিছু তাঁর।

হযরত রাবেয়াকে অনেক সময়ই ছিন্ন বসনে দেখা যেতো। একদিন বসরার একজন অভিজাত লোকের এটা হৃদয় স্পর্শ করল। সে বলল, 'মা, যদি আপনি অনুমতি দেন, তাহলে অনেকেই আছে যারা আপনার সকল অভাব দূর করতে কৃতজ্ঞ বোধকরবে।'

রাবেয়া উত্তরে বললেন, 'হে আমার পুত্র, বাইরের লোকের কাছে আমার অভাবের কথা বলতে লজ্জাবোধ করি। সমগ্র দুনিয়ার মালিক আল্লাহ। যদি আমি অভাববোধ করি, তাহলে এটা দূর করার জন্য আল্লাহকেই আমি বলবো।'

আল্লাহর পথে, আল্লাহর জন্যে সব যাঁরা বিলিয়ে দেন, বিলিয়ে দেন নিজের সুখ–সম্ভোগ– সব, হযরত রাবেয়া বসরী এমনি একজন মহিয়সী মহিলা।

মানুষ আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের অফুরন্ত নিয়ামত ভোগ করে, খুব কমই তাঁর জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। অথচ সামান্য দুঃখ–কষ্টে তাদের হা-হুতাশের অন্ত থাকেনা।

এই কথাটাই তাপসী রাবেয়া বসরী কত সুন্দর ভাষায় একদিন বললেন।

একদা মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা একজন লোক রাবেয়া বসরীর কাছে এলেন। তারপর এভাবে দু'জনের মধ্যে কথা শুরু হলো ঃ

রাবেয়া– মাথায় ব্যান্ডেজ কেন?

আগন্তুক– গত রাত থেকে আমার ভীষণ মাথাব্যথা।

রাবেয়া– আপনার বয়স কত?

আগন্তুক– ৩০ বছর।

রাবেয়া– জীবনের অধিকাংশ সময় কি আপনার কষ্ট ও বেদনায় কেটেছে?

আগন্তুক– না।

রাবেয়া–'ত্রিশ বছর ধরে আল্লাহ আপনার দেহকে সুস্থ রেখেছেন, কিন্তু এর জন্যে কোন কৃতজ্ঞতার ব্যান্ডেজ আপনি ধারণ করেননি। আর মাথায় এক রাতের বেদনাতে আপনি অভিযোগের ব্যান্ডেজ ধারণ করলেন?'

কাযী আবু জাফর বিন আব্দুল ওয়াহিদ হাশমী বর্ণনা করেছেন ঃ একদিন কাযী আবু উমার রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে মদের পাত্র ভেঙ্গে প্রচুর মদ ছড়িয়ে থাকার দৃশ্য তাঁর চোখে পড়ল। একজন প্রত্যক্ষদর্শী যিনি কাযীর সাথে হাঁটছিলেন তিনি বললেন, 'এভাবে মদ ছড়িয়ে উৎকট গন্ধ ছড়ায়।' কাযী শুনলেন কিছুই বললেন না। কিন্তু একদিন ঐ লোক সাক্ষী হয়ে তাঁর আদালতে আসল কোন এক ব্যাপারে, কাযী তাঁর সাক্ষ্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন।

সাক্ষী লোকটি খুব ভীত হয়ে পড়ল। সে অন্য লোকের দ্বারা জানতে চাইল এর কারণ কি।

কারণ হিসাবে কাযী সে দিনের ঘটনার উল্লেখ করে বললেন, 'মদ ইসলামে হারাম। এর গন্ধ খারাপ কিংবা ভাল তা বিবেচ্য বিষয় নয়। কিন্তু সে এ বিষয়টাকেই বিবেচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। সুতরাং হয় সে প্রবঞ্চনা করছে অথবা মিথ্যা বলছে কিংবা সে কিছুই বুঝে না অজ্ঞ। সুতরাং আমি তার সাক্ষ্য গ্রহণ করতে পারি না।'

আল্লাহর ধ্যানে সর্বদা মশগুল থাকতেন তাপসী রাবেয়া বসরী।

সকল সৃষ্টির স্রষ্টা, সব সৌন্দর্যের উৎস পরম প্রভু আল্লাহই ছিল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান।

বসরায় সেদিন বসন্তের সকাল। বসরায় বিখ্যাত গোলাব বাগানগুলো ফুলসম্ভারে পূর্ণ। বাতাস সে ফুলের গন্ধ ছড়িয়ে চারদিক মোহিত করছিল। পাখি গান গাইছিল। বুলবুলগুলো যেন ফিসফিস করে গোলাবের প্রতি তাদের ভালবাসা প্রকাশ করছিল। চারদিকটা বসন্তের নতুন প্রাণচাঞ্চল্যে নেচে উঠছিল।

পরিচারিকা তাপসী রাবেয়াকে গিয়ে বললো, বাইরে আসুন। দেখুন, বসন্তে প্রকৃতি কি অপূর্ব রূপ সম্ভারে সেজেছে। রাবেয়া তাঁর নামাযের ঘর থেকে বললেন, 'বাইরের দুনিয়া স্বতঃ পরিবর্তনশীল। রূপবৈচিত্র্য আর কি দেখব, তুমি আস এবং একবার বসন্তের যিনি স্রষ্টা তাঁর অকল্পনী সৌন্দর্যের দিকে তাকিয়ে দেখ।'

পরম প্রভুর পরম সৌন্দর্য যাঁরা উপলব্ধি করেন, দুনিয়ার কোন সৌন্দর্যই তাঁদের কাছে সৌন্দর্য নয়।

আল-বেরুনীর জ্ঞান পিপাসা

জ্ঞানানুসন্ধিৎসু আল-বেরুনীর মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে ফকীহ আবুল হাসান বলেন ঃ

"যখন আমি তাঁর শয্যাপাশে গেলাম, তখন দেখলাম তিনি শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। তিনি আমাকে দেখে বললেন, একদিন আপনি আমাকে নানীর সম্পত্তির অংশ ভাগ সম্পর্কে বলেছিলেন। আপনি কি অনুগ্রহ করে সে কথা বলবেন যাতে আমি তা আবার স্মরণ করতে পারি।"

আমি বললাম, 'আপনার এই অবস্থায় সেই আলোচনা আমি কিভাবে তুলি?'

তিনি বললেন, 'এ বিষয়টি না জেনে পৃথিবী থেকে যাওয়ার চেয়ে জেনে যাওয়াই ভাল।'

আমি সেই ভাগ-বন্টনের ফর্মুলা বললাম। আল-বেরুনী তা মুখস্থ করে আমাকে শুনালেন তাঁর ভুল শুধরাবার জন্যে।

এর পর তাঁর শয্যাপাশ থেকে চলে এলাম। রাস্তায় পা দেবার আগেই শুনতে পেলাম সেই জ্ঞানতাপস আর দুনিয়াতে নেই।

বাবরের আমানতদারী

ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবর। মধ্যএশিয়ার ফারগানা রাজ্যের শাসন কর্তার তিনি ছেলে। পরে তিনি ফারগানার শাসনকর্তা হন। বহু উত্থান-পতনে ভরা ছিল তাঁর জীবন। সবকিছু ছাপিয়ে তাঁর চরিত্র ছিল হিরকের মত উজ্জ্বল। তাঁর সততা, মানবিকতা ছিল কিংবদন্তির মত মানুষের মুখে মুখে।

বাবর যখন ফারগানার শাসনকর্তা, তখন একটি বাণিজ্য কাফিলার মালিক ইন্দিজান পাহাড় এলাকায় বজ্রপাতে মারা যায়। বাবর এ কাফিলার সমস্ত সম্পদ সংগ্রহ করে জমা করতে এবং মালিকের উত্তরাধিকারীদের কাছে ফেরত দেয়ার নির্দেশ দেন।

দু'বছর পর এ উত্তরাধিকারীরা আসে এবং সমস্ত জিনিস ফেরত পায়। বাবরকে তারা উপঢৌকন দিতে চায়। কিন্তু বাবর শুধু প্রত্যাখ্যানই করেননি উপরন্তু তাদের আসা-যাওয়ার সব খরচ বহন করেন।

মোগল আমল।

সম্রাট আকবরের ছেলে জাহাঙ্গীর তখন মোগল সাম্রাজ্যের প্রতাপশালী সম্রাট।

একদা তিনি শায়খ আহমদ সরহিন্দীকে দরবারে ডেকে পাঠালেন।

শায়খ আহমদ ছিলেন ইসলামী আন্দোলনের এক অকুতোভয় কর্মী পুরুষ।

জাহাঙ্গীরের দরবারে এ রেওয়াজ ছিল যে, কোন ব্যক্তি দরবারে আগমন করলে প্রথমে বাদশাহকে কুর্নিশ করতে হতো।

বাদশাহ আশা করেছিলেন শায়খ আহমদ তাই করবেন। কিন্তু তিনি দরবারে প্রবেশ করে ইসলামী বিধান অনুযায়ী সালাম করলেন।

বাদশাহ রাগান্বিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার সাহস তো কম নয়। আপনি কেন দরবারের বিধি লংঘন করলেন? কেন সম্মানসূচক কুর্নিশ করেননি?'

জবাবে শায়খ আহমদ বললেন, 'হে সম্রাট! যে মস্তক প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার সম্রাটের সম্রাট রাব্বুল আলামীনের সামনে নত হয়, সে মাথা দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে নত হতে পারে না, তিনি যত বড় শক্তিধরই হোন না কেন।'

আওরঙ্গজেব নিরপেক্ষ তদন্তের স্বার্থে সন্তানকে কারাগারে পাঠালেন

বাদশাহ আওরঙ্গজেব যে কত বড় ন্যায়বিচারক ছিলেন, তাঁর ৫০ বছর রাজত্বকালের হাজার হাজার ন্যায়বিচারের ঘটনা থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি বলতেন, বিচার ক্ষেত্রে শাহজাদাদেরকেও আমি সাধারণ লোকের পর্যায়ভুক্ত মনে করি। বাদশাহ আওরঙ্গজেব ১০৮২ হিজরী সনে এক আদেশ জারি করেন, জিলায় জিলায় প্রতিনিধি নিযুক্ত করে জনসাধারণকে জানিয়ে দেয়া হোক যে, বাদশাহর বিরুদ্ধেও যদি কারো কোন অভিযোগ থাকে, তাহলে নির্ভয়ে তা পেশ করতে পারবে।। সরকারী প্রতিনিধি সে সব অভিযোগের কৈফিয়ত প্রদান করবে। অভিযোগ সত্য প্রমাণিত হলে অভিযোগকারী তার অধিকার ফিরে পাবে। বাদশাহ সরাসরি দায়ী হলে বাদশাহ নিজেই তার প্রতিকার করবেন।

মির্যা কামবখশ আলমগীরের অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ পুত্র ছিলেন। তাঁর দুধ ভাইয়ের বিরুদ্ধে হত্যার অভিযোগ আরোপিত হয়।

আলমগীর আদেশ দিলেন যে, বিচারালয়ে এর তথ্যানুসন্ধান করা হোক। তদন্তের নিরপেক্ষতা যাতে কোনভাবেই নষ্ট না হয়, কোন সুফারিশ যেন গ্রাহ্য করা না হয়, সুফারিশকারী যদি বাদশাহর সন্তানও হয়।

কিন্তু কামবখশ তার দুধ ভাইয়ের পক্ষে দাঁড়ালেন। আলমগীর কামবখশকে দরবারে ডেকে পাঠালেন। কামবখশ দুধ ভাইকে সংগে নিয়ে আসলেন।

আলমগীর নিজ সন্তানকে গ্রেফতার করে তদন্ত কমিটিকে বললেন, 'এবার নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারবে।'

জাভার পশ্চিম প্রান্তে পাজাজারান নামে একটি রাজ্য।

দ্বাদশ শতকের শেষ দিকে সেখানে এক রাজা ছিলেন। রাজার ছিল দুই ছেলে। বড় ছেলে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। এবং ব্যবসায় উপলক্ষে তিনি ভারতে যান। এই সময় রাজার মৃত্যু হলে ছোট ছেলে সিংহাসনে আরোহণ করেন।

রাজার বড় ছেলে তাঁর বাণিজ্য সফরের এক পর্যায়ে কিছু আরব বণিকের দেখা পান এবং তাদের কাছে ইসলাম গ্রহণ করেন। তাঁর নতুন নাম হাজী পুরওয়া। পরে রাজপুত্র হাজী পুরওয়া একজন আরব ধর্ম প্রচারকসহ দেশে ফিরে গেলেন এবং রাজা ও রাজ পরিবারকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকার করল এবং হাজী পুরওয়াকে হত্যার ষড়যন্ত্র করল।

ভাই এবং অন্যান্যের এই ষড়যন্ত্রের মুখে রাজপুত্র হাজী পুরওয়া জঙ্গলে আশ্রয়নিলেন।

তারপর কেউ আর তাঁর সন্ধান পায়নি। কিন্তু তাঁর চেষ্টা বৃথা যায়নি।গোটা জাভাই পরে ইসলামের ছায়ায় আশ্রয় নেয়।

হাজী পুরওয়া রাজা ও রাজ পরিবারকে ইসলাম গ্রহণ করাতে পারেননি, কিন্তু জঙ্গলে গিয়ে জনগণের কাতারে শামিল হয়ে গোটা দেশকেই ইসলাম গ্রহণকরিয়েছেন।

১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে। ইংরেজ, নিযাম ও মারাঠার মিলিত বাহিনী শ্রীরঙ্গপত্তমে বীর টিপুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

টিপু ও টিপু সুলতানের ছোট্ট বাহিনী নির্ভীকভাবে তাদের মুকাবিলা করলো। নিহত হলো অনেক শত্রু সৈন্য। কিন্তু শত্রুর বিশাল বাহিনীর প্রবল চাপে ভেঙ্গে পড়ল দুর্গের সিংহদ্বার।

ক্ষুদ্র বাহিনী সাথে নিয়ে টিপু সুলতান দুর্গদ্বার রক্ষার জন্যে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। গুলীর অবিরাম বৃষ্টি তাদের ভয় দেখাতে পারল না। অকস্মাৎ একটা গুলী এসে টিপুর বাম পাশে বিদ্ধ হলো। কিন্তু তিনি স্থান ত্যাগ করলেন না, তাঁর কোন সৈন্যও নয়।

টিপুর সৈন্যের মৃতদেহের স্তূপ দুর্গের দ্বার প্রায় বন্ধ করে দিল। এ সময় আরেকটি গুলী টিপু সুলতানের বাম বুক বিদ্ধ করল। অজস্র রক্তপাতে সিংহদিল টিপু লুটিয়ে পড়লেন মাটিতে। কিন্তু অস্ত্র তিনি ত্যাগ করেননি। একজন ইংরেজ তাঁর স্বর্ণ নির্মিত তরবারির বাঁটের জন্যে অগ্রসর হলো। টিপু বাম বাহুর উপর ভর করে মাথাটা তুলে এক আঘাতে তাকে শেষ করে দিলেন। আরও একজন ছুটে এলো তাঁর দিকে। তাকেও তিনি শেষ করলেন। আরেকটি গুলী এসে এ সময় তাঁর কপালে বিদ্ধ হলো।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন টিপু। তাঁর মুখে কোন ভয়, দুশ্চিন্তা কিংবা উদ্বেগের ছাপ ছিল না, ছিল তাতে অসাধারণ এক প্রশান্তি ও দৃঢ়তার ছাপ। যেন গভীর প্রশান্তিতে ঘুমিয়ে পড়েছেন তিনি।

বাদশাহ ইবনে সউদের বিচার

বহু বছরের অশান্তি, অবিচার, বিশৃংখলা, হানা–হানির পর বাদশাহ ইবনে সউদ আরব ভূখন্ডে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্বস্তি ও নিরাপত্তা ফিরে এসেছিল মানুষের মধ্যে।

বাদশাহ ইবনে সউদের বিচার কিংবদন্তির মত আলোচিত হয় মানুষের মুখে মুখে।

এক দিনের ঘটনা।

ইবনে সউদ তাঁর দরবারে বসেছিলেন। স্থানীয় শেখ ও গোত্র সর্দারেরা তাঁর চারদিকে ঘিরে বসেছিল। এ সময় একজন মহিলা এসে নালিশ করল, তার প্রতিবেশীর গরু তার বাগানে ঢুকে বাগানের সবটা ক্লোভার গাছ খেয়ে ফেলেছে।

ইবনে সউদ মহিলার প্রতিবেশীকে দরবারে হাজির করার পর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে সে শপথ করে অভিযোগ অস্বীকার করল।

অবশেষে ইবনে সউদ কসাইকে নির্দেশ দিলেন গরু জবাই করে পেট ফাঁড়ার জন্যে। গরুর পেট ফেঁড়ে গরুর পেটে ক্লোভার গাছ পাওয়া গেল।

ইবনে সউদের রায়ে মহিলার প্রতিবেশী দোষী সাব্যস্ত হলো। রায় অনুসারে তাকে মহিলার ক্লোভার গাছের পুরো ক্ষতিপূরণ দিতে হলো এবং মিথ্যা শপথ করার জন্য দিতে হলো বিরাট রকমের জরিমানা।